Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিয়া আক্তার জুঁই

রোলঃ 23090120697

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিয়া আক্তার জুঁই

রোলঃ 23090120697

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামে সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাকিয়া আক্তার জুঁই, আইডিঃ 23090120697 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

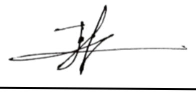

(স্বাক্ষর)

জাকিয়া আক্তার জুঁই

আইডিঃ 23090120697

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 3

ইসলামে সহাবস্থান 5

সহাবস্থানে অমুসলিমদের অধিকার 10

ইসলামে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 15

সহাবস্থানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবহার 20

ওয়াহদাতুল আদিয়ানা 25

সংলাপের চক্রান্ত 34

ইসলামে সাংঘর্ষিক সংলাপ 41

শর্তসাপেক্ষে সংলাপ 58

বর্তমানে সহাবস্থান ও সংলাপের প্রভাব 62

ফুটনোট 66

ভূমিকা

আসসালামু আলাইকুম। সকল প্রশংসা আল্লাহর,যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে। শুকরিয়া এজন্যে যে আমরা পৃথিবীতে এসেছি মুসলিম হিসেবে।সকল নবী রাসুলগণ ইসলামের বানী পৌঁছালেও বর্তমানে পৃথিবীতে আছে অসংখ্য ধর্ম এবং তাদের অনুসারী।

মানুষ সামাজিক জীব,তাই প্রায় সকল ধর্মের মানুষই একত্রে সমাজে বসবাস করি।আর তাই বৈচিত্র্যতার কারনে তৈরি হতে পারে মত-বিরোধ, দ্বন্দ্ব। সমাজে বসবাসের জন্য আমাদের মাঝে দরকার সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, মিথস্ক্রিয়া।একটি সমাজে তার রাষ্ট্রের মৌলিক অবিচ্ছেদ্য অংশ।তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখতে হলে সমাজ পর্যায়ে দেশ গঠন করতে হবে।
এই সমাজেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একই সাথে বসবাস করে ।তাই ভিন্ন মতের মতো ভিন্ন ধর্মেও রয়েছে ব্যবধান,পার্থক্য। যা প্রায়ই রূপ ন্যায় ধর্মীয় দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ।তাই এসকল সমস্যার সমাধান '**সহাবস্থান ও সংলাপ**'।

ধর্মীয় সহাবস্থান বলতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অন্যের ধর্মের প্রতি যে সম্মান, শ্রদ্ধার সাথে নিজ ধর্ম নিয়ে একত্রে বসবাস বা অবস্থান কে বোঝায়।প্রত্যেক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সহাবস্হানের ধারনা প্রায় একই।আর এই সহাবস্থান তখনই সম্ভব যখন পরস্পরের মধ্যকার চিন্তাধারা একে অপরের সাথে মিলিত হবে। তার অন্যতম পথ **'সংলাপ'**। সংলাপ বা Dialogue হচ্ছে কথপোকথন,আলোচনা। একে অপরের সাথে নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনাই **আন্তঃধর্মীয় সংলাপ**।ইসলাম সফলভাবে সহাবস্থান ও সংলাপ নিয়ে কাজ করেছে ,করছে এবং করবে।

অতীতে সহাবস্থান ও সংলাপের প্রভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে দেখি।এ বিষয়ে বর্তমানে বিস্তৃত ভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।বর্তমান সমাজে আধুনিকতার কারনে নিজস্ব ধর্মীয় স্বত্তা হারিয়ে যাচ্ছে,নয়ত জ্ঞান স্বল্পতার কারনে ধর্মীয় গোঁড়ামিতে বাঁধছে দাঙ্গা।তাই এই উশৃঙ্খল সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সহাবস্থান সম্পর্কিত সংলাপ।

বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি,আধুনিকতার নেতিবাচক প্রভাব এই জেনারেশনের উপর, ইসলাম ও মুসলিমদের উপর অমুসলিমদের ব্যঙ্গ দৃষ্টি ইত্যাদি আমাকে ভাবিয়ে তোলে।তাই যখন

সময় আসে শেখার সুযোগের আমি বেছে নেই এই বিষয়।ইসলামে মানেই অন্যের ধর্মে নাক গলানো এমনটা নয়,আমরা প্রত্যেক বিষয়ে গবেষনা আলোচনায় বিশ্বাসী এবং অন্যকেও জানার ও জানানোর প্রতি তাকিদ দিয়ে থাকি।নবী করিম (স) যেমন মুশরিক, ইহূদিদের সাথে একই সমাজে সহযোগিতার মাধ্যমে বসবাস করেছেন,তেমনি করেছেন আন্তঃসংলাপ।আর তার রেখে যাওয়া সুন্নাহ,আমাদের জীবন ব্যবস্থা।সেই প্রেক্ষিতেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

সহাবস্থান শব্দটি মুলত ২টি শব্দ থেকে তৈরি।সহ + অবস্থান= সহাবস্থান।
গণনামূলক বা ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় সহাবস্থান (Collocation) হচ্ছে দুই বা তার বেশি শব্দ নিয়ে গঠিত এক ধরনের শব্দ গুচ্ছ যা মূলত একই কাজ করে।[১]
সহাবস্থানের পারিভাষিক অর্থ - শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বসবাস করা। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি একে অপরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে একে অপরের ক্ষতি না করে একসাথে বসবাস করা।
সহাবস্থানকে কিছু সমার্থক শব্দ দিয়ে পরিষ্কারভাবে বোঝানো যায়।যেমন, একত্রে থাকা, মিলিতভাবে থাকা, একই সাথে বিদ্যমান থাকা,শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সুস্থভাবে থাকা।

অর্থাৎ সহাবস্থানকে নিম্নোক্ত ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়-
ভিন্ন গোষ্ঠী,জাতি, শ্রেণী একত্রে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভাবে,ক্ষতি না করে বসবাস করাকে সহাবস্থান বোঝায়।
উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী,
Coexistence is the property of things exist at the same time and in a proximity close enough to affect each other without causing harm to one another. The term is often used with respect to people of different persuasions existing together particularly where, there is some history of antipathy or violence between those groups.[২]
সহাবস্থান হল এমন জিনিসের বৈশিষ্ট্য যা একই সাথে এবং এত কাছাকাছি থাকে যে একে অপরের ক্ষতি না করে একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। এই শব্দটি প্রায়শই একসাথে থাকা বিভিন্ন মতবাদের লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বিশেষ করে যেখানে এগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিদ্বেষ বা সহিংসতার কিছু ইতিহাস রয়েছে।

আমাদের সমাজের দিকে তাকালেই আমরা সহাবস্থান এর বাস্তবিক উদাহরন দেখতে পাই।একই সমাজে আমরা নানা শ্রেনী-পেশার মানুষ বসবাস করছি। ধনী-গরীব,হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী,শিক্ষিত-অশিক্ষিত,বর্ণ পার্থক্য ইত্যাদি। এদের সবাইকে নিয়েই সমাজ।প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।একটি পরিবারেই ভিন্ন মতাদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সামাজিক ভাবে এর প্রভাব আরও বিশাল।তারপরও একই সমাজে আমরা একত্রে আছি কোনো সহিংসতা ছাড়াই - এটিই সহাবস্থান।

সহাবস্থানের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন ,শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-কোন বিদ্বেষ ছাড়াই স্থিতিশীলতা বজায় রেখে একই সাথে বসবাস করা।
পার্থক্যকে সম্মান- সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক গোষ্ঠীর পার্থক্যকে সম্মানের চোখে দেখা।
সম্প্রীতি ও অহিংস সমাধান - ঝগড়া বিবাদ ছাড়া একে অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ না রেখে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করা।

যেহেতু চিন্তা থেকে শুরু প্রায় সব জায়গাতেই পার্থক্য রয়েছে তাই স্বভাবগত ভাবেই প্রায়শই দেখা দেয় মতানৈক্য,বিভেদ,অমিল।সহাবস্থানের মূল্যবোধ ঠিক রাখতেই এগোতে হয় সমঝোতার দিকে আর যা সম্ভব হয় পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে।যাকে বলতে পারি **সংলাপ**।
সংলাপ শব্দের অর্থ কথাবার্তা বিনিময়,আলাপ আলোচনা করা **সংলাপ** শব্দের আভিধানিক অর্থ,সং -সঙ্গে,সম বা সমান + আলাপ- সমতায় থেকে পারস্পারিক আলাপ।[৩]

আরবি ভাষায় এর প্রতিশব্দ আল হিওয়ার (الحوار)।
সাধারণ অর্থে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মাঝে আলোচনাকে সংলাপ বলে।

যখন এই সংলাপ ই ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগঠিত হয় তাকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বলে। বিভিন্ন ধর্মের মাঝে পারস্পরিক সংলাপকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বলে।

সাধারণত দুই বা ততোধিক ধর্মের ব্যক্তিবর্গের মাঝে কোন বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ নিয়ে মৌখিক বা লিখিত উপায়ে বা আচরণগত মিথস্ক্রিয়ায় পরস্পর আলোচনা ও কথোপকথন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় কে **'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ'** বলা হয়।[৪]
ইংরেজীতে একে interreligious or interfaith dialogue বলে।আরবীতে 'আল হিওয়ার বাইনাল আদয়ান' বলে ।
উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী,
Interfaith dialogue refers to cooperative, constructive and positive interaction between people of different religious traditions (i.e "faiths") and/spiritual or humanistic beliefs,at both the individual and institutional levels.[৫]

ইসলামে সহাবস্থান

ইসলাম শান্তির ধর্ম।যদিও প্রত্যেক ধর্মই শান্তির বাণী দিয়ে থাকে। ইসলাম শুধু ব্যক্তি জীবনে শান্তির বাণী পৌছায় না,বরং সমাজ পরিশেষে রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরিতে কাজ করে।আমাদের সকল নবী রাসুলগণের জীবনী থেকে আমরা দেখতে পাই , তৎকালীন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে একই সমাজে বসবাস করেছে। বরং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী রাই প্রত্যেক নবী রাসূল কে তাদের ধর্ম অনুসরণের জন্য জোরাজুরি করতো, তাঁরা তা না মানলে নির্যাতন থেকে হত্যা পর্যন্ত উদ্যত হতো।অথচ ,নবী রাসুলগন দিতেন শান্তির বাণী। প্রত্যেককে ইসলামের বাণী পৌছে দিতেন কেননা ইসলাম কে না জানলে এর সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে না।তবে জোর পূর্বক ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার হুকুম ইসলামে নেই।

ইসলামের প্রধান শর্ত ঈমান ও আকিদা। অর্থাৎ আল্লাহ এক , মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল , কোরআন আল্লাহর বাণী।এ সম্পর্কিত সবকিছুকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাই ঈমান। ঈমান জোরপূর্বক কারো মাঝে আনা সম্ভব নয়।তাই জোরপূর্বক কাউকে ইসলাম গ্রহণ করায় বাধ্য করানো সম্ভব নয়।
কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,
'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধকতা নেই।' -(সূরা বাকারা, ২৫৬)

নবী-রাসুলগনের ব্যক্তিত্বের কারনে যখন সবাই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়, তখনই গোঁড়ামিতে আঁকড়ে থাকা ব্যক্তিরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হতো।কেননা এর ফলে তাদের পথ অনুসরণ করার লোকবল কমে যেত।
বরং এক সাথে বসবাসের মাধ্যমেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজ ।তাই শুরু থেকেই ইসলাম সহাবস্থানের বিষয়ে তাগিদ দিয়ে এসেছে।
প্রত্যেক মুসলমান একজন দায়ী,তাই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ করে ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে সহানুভূতিশীল হয়ে মিলেমিশে থেকে তাদের কাছে সত্যের বানী পৌঁছানোই আমাদের দায়িত্ব।আমাদের কিতাব ,বই তাঁরা পড়বে না, বাহ্যিক ভাবে আমরাই তাদের বই,আমাদের কর্মেই ফুটে উঠবে নিয়ম নীতি।
তাই তাদের কাছে এই পাঠাগার সহজলভ্য করতেই সহাবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

নবী করিম (স) নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ সময় মক্কাতেই মুশরিকদের সাথে বসবাস করেন,তারপর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী হজরত খাদিজা রা এর ওফাতের পর, প্রতিকূল

পরিস্থিতিতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।সেখানে মক্কা থেকে উত্তম রাজনৈতিক পরিবেশ থাকলেও এক অংশ ছিল যারা ইসলামের বিপক্ষে ছিল। তাদের সাথেও সময়ের সাথে সামাজিক গণ্ডিতে একসাথে বসবাস করেছেন রাসুলুল্লাহ (স)। মদিনা হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদিনার মুসলিম সমাজকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং পরিচ্ছন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে রাসূল (স) সক্ষম হলেন। এর পাশাপাশি মদিনার অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক উন্নয়ন ও পারস্পারিক সমঝোতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বনু আউফ ইহুদি গোষ্ঠীর পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে মদিনায় বসবাস একই সমাজে ব্যবস্থায় বসবাস করেন।[৬]

সমাজে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রেখে বসবাস করার অন্যতম শক্তি,পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। যার সর্বোত্তম উদাহরণ রাসূল (স) শিখিয়ে গিয়েছেন।

হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, ‘তা কি প্রাণ নয়?’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২৫০)।

ইসলামের মৌলিক যুগে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) এর সময়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাথে একই সমাজে বসবাসের উদাহরণ থাকলেও পরবর্তীতে আরবে একই সমাজে ইহুদী-মুশরিকদের নিষিদ্ধ করা হয়। মৌলিক সময়ে একসাথে থাকার কারণ ছিল ইসলামের মূল সৌন্দর্য কাছ থেকে তাদের শেখানো। রাসূলুল্লাহ (স) অন্তিম শয্যায় এ বিষয়ে ওসিয়ত করে যান। যার দায়িত্ব পরবর্তীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার খেলাফত সময়ে পালন করেন। আরব ও রোমের সীমান্তবর্তী জায়গা গুলোতে কিছু গোত্র ছিল যারা মূলত মুসলিমদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ছিল কিন্তু তারা গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতো হেরাক্লিয়াসের। এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তারা গুপ্তচর প্রবৃত্তি বন্ধ করেনি তাই তাদের পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসন ও বিতাড়িত উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য গৃহীত পদ্ধতির মধ্যে ফুটে ওঠে। তাদেরকে আরব সীমান্তের বাইরে, সিরিয়ায় চলে যাওয়ার সময় সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। আরবে তাদের অধিকৃত জমির চাইতে অধিক পরিমাণ উর্বর জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এবং তাদের আর্থিক ও দৈহিক কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

মুসলিমরা ইনসাফ ও সহানুভূতির উদাহরণ, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে দেন। হযরত ফারুক (রা) উমাইয়া (রা) কে নির্দেশ দেন তুমি ইয়ামানে গিয়ে

নাজান বাসি খ্রিস্টানদের বলো,' তোমরা এদেশ ছেড়ে দাও আমরা তোমাদেরকে আরো সীমান্তের বাইরে সিরিয়ায় তোমাদের এ জমির চাইতে অধিক পরিমাণ উর্বর জমি দেব। আর আমরা তোমাদেরকে কোনরূপ আর্থিক বা দৈহিক কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাই না। এখন থেকে আরব দেশে শুধু মুসলমানগনই থাকবে। তোমাদের অবস্থান সম্ভব নয়।

বর্তমান যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের ইহুদি খ্রিস্টান দ্বারা নির্যাতিত, বিতাড়িত হতে দেখলে এই সকল সভ্যতার উচ্চ শিখরে পৌঁছানো জাতিদের কে চোখে আঙুল দিয়ে ইসলামের সভ্যতা কে দেখিয়ে দেয়ার তাগিদ অনুভব করি।

ইসলাম ধর্মান্ধতা,গোঁড়ামিতে বিশ্বাসী নয় তাঁর অনেক উদাহরণ শুধু রাসুলুল্লাহ (স) এর সময়েই নয় , বরং পরবর্তী খিলাফত কালীন সময়ে এর উদাহরণ দেখা যায়। যেমন খলিফা হযরত মুয়াবিয়ার রাঃ এর সময়ে শ্যাম অঞ্চলের দাপ্তরিক কার্যক্রম রোমান ভাষায় পরিচালিত হতো। রোমান ভাষা খ্রিস্টানদের ভাষা, কিন্তু তিনি এখানে এমন মনোভাব রাখেননি যে, আমরা খ্রিস্টানদের ভাষা কেন গ্রহণ করব? এটা কাফেরদের ভাষা, তাই গ্রহণ করা যাবে না ,এমন কোন মনোভাব ছিল না। বরং প্রতিটি ভাষায় হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পক্ষ থেকে নেয়ামত। তাই প্রত্যেক ভাষারই কদর করতে হবে, সে যেকোনো ভাষাই হোক না কেন। তবে কোরআন ও হাদিসের ভাষা হিসেবে আরবির যে মর্যাদা সেটা ভিন্ন বিষয়।

সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি, ৫২১ হিজরি পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখেন। শাম অঞ্চলে মুসলিমদের করায়ত্তে রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৫৩৯ হিজরী সনে তিনি এডেসা অবরোধ পুনরুদ্ধার করেন। এডেসা নগরী জয় করার পর সুলতান সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদের সঙ্গে কোমল ও উদার আচরণ করেন। খ্রিস্টান নাগরিকরা অবাক বিষয়ে প্রত্যক্ষ করে জিনকির ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং ইসলামের দয়া ও উদারতা।

এই ছোট ছোট উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় ইসলাম সহাবস্থানে বিশ্বাসী এবং উত্তম ভাবে সমাজ রাষ্ট্রের ভূমিকা রাখায় পারদর্শী।

রাসূলুল্লাহ (স) এর শাসনামলে হাবসার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে পত্র প্রেরণ, মিশরের সম্রাট মোকাওকিসের কাছে পত্র প্রেরণ, রোমের সম্রাট কায়সারের কাছে পত্র প্রেরণ এরকম বহু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ থেকে প্রকাশ পায় শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেশী অমুসলিম দেশের সাথে রাজনৈতিক সম্প্রীতি গড়ে তুলেছিলেন। ওতে যে দেশের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি করতেই এ সকল পদক্ষেপ নেয়া হতো। দ্বীনের দাওয়াত ও এর মধ্যকার অংশ। রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলিম রাজ্যের কর্তৃক পাঠানো উপঢৌকন খুশিমনে গ্রহণ করতেন।

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এই সহাবস্থানের ভয়ংকর অবনতি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রায় প্রতিটি অমুসলিম দেশে এই সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। ছোট ছোট বিষয় থেকেও হচ্ছে হত্যাকাণ্ড। যার ফলে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ। গরুর মাংস খাওয়ার যের ধরে শুরু করে শুধু মাত্র মুসলমান হওয়ার কারণবশত হতে হচ্ছে হত্যার শিকার। অন্যদিকে মুসলিম দেশে অন্যান্য ধর্মের সাথে সহাবস্থানের অজুহাতে চলছে নানা শিরক ও কুফরি । ইসলাম অন্য ধর্মকে সম্মান করায় বিশ্বাসী তবে অন্য ধর্ম পালনে নয়। মূলত সকল ধর্মই অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলে। সকল ধর্ম মিলিয়ে নতুন ধর্ম পালন, ইসলাম তা মেনে নেয় না।একজন মুসলিম প্রতিবেশী বা নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনে সুযোগ করে দেয়া,তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করা,কুশল বিনিময় করা। রাসূলুল্লাহ (স) অমুসলিম কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন, অর্থাৎ মুসলিমরা কখনোই অমুসলিমদের শত্রু নয়।একজন ইহুদী বালক রাসূলুল্লাহ (স) এর খিদমতে কাজ করতো।সে অসুস্থ হওয়ায় নবী করিম (স) তাকে দেখতে যান ,এবং ইসলামের দাওয়াত দেন।সে তার পিতার অনুমতিতে ইসলামের ছায়াতলে আসে।

তবে বর্তমানে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতি,নিয়ম নীতি ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে। বর্তমানে কুৎসিত একটি প্রচলিত কথা রয়েছে যা সমাজে ধর্মীয় অবক্ষয় তৈরি করছে। ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’,যা ইসলাম কখনই মেনে না।এটি ধর্মীয় নীতি পরিপন্থী।

এ বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

قُلْ يَاَيُّهاَ الْكٰفِرُوْنَ .

বল,হে কাফিরেরা!

لاَاَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.

আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর,

وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ.

এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি।

وَلاَ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ.

এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার বাদ তোমরা করে আসছো,

وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ.

এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ.

তোমাদের জন্য তোমাদেরও কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।

(সূরা কাফিরুন)

এই সূরার তাওহীদের পাশাপাশি অন্যতম বার্তা হচ্ছে ‘কাজের স্বতন্ত্রতা’।এই সূরার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে কোনো আপোষ সম্ভব নয় এবং উভয়ের পথ ও তার ফলাফল ভিন্ন। অতএব , ধর্ম এবং কর্ম,দুই পৃথক।

ইসলামের বার্তা পৃথিবী জুড়ে সাহাবাগণ,তাবেঈন,তাবে-তাবেঈন ও পরবর্তীতে ওলি-আউলিয়াগণ ভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারণার কাজ করেন। তেমনি ভাবে ভারত উপমহাদেশেও আবির্ভাব হয় ইসলামের। তবে এ বিষয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় উত্তর আফ্রিকা,প্রাচীন রোম পারস্য অঞ্চলে যেভাবে ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল, ভারত উপমহাদেশে সেরকম হয়নি। অথচ দীর্ঘ সময় ভারত শাসন করেছে মুসলিম শাসকগণ। এর কারণ হিসেবে বেশ কিছু পারিপার্শ্বিক বিষয় উঠে আসে। যেমন, ভারত শাসনকারী মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশই ছিল ইসলাম গ্রহণের তুলনামূলক নবীন, মাত্র কয়েকটি প্রজন্ম আগে তাদের পূর্বপুরুষ ইসলাম কবুল করেছিল। প্রায় সবাই ছিল অনারব বিভিন্ন তুর্কি বা আফগান গোত্র থেকে আগত। আরবি ভাষার সাথে সম্পর্কহীন হওয়ায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান , সঠিক দ্বীনী পরিবেশ দু তারিখ অভাব ছিল। তাই দ্বীনী চেতনা বোধ ছিল তুলনামূলক কম। রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে তাদের মূল আকর্ষণ ছিল। অনেক শাসকগণ জনগণের মনোরঞ্জনের জন্যই সব ধর্মকে প্রশ্রয়, দিত সবাই সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত। ধর্মীয় মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে শাসন তান্ত্রিক সহযোগিতার আশায় সব রকমের স্বাধীনতা দিয়ে থাকতো। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুমোদিত হতে পারে না এমন অনেক বিধর্মী কোথাও তারা বন্ধ করেনি ,যেমন হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা। আবার হারাম বিষয়কে অনুমোদন দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতো, বিধর্মী নারী বিয়ে করা। গৃহপালিত পশু গরু কোরবানি বা জবাই করা ইসলামে হালাল, শুধুমাত্র হিন্দুরা গরুকে দেবতা মনে করত। যার ফলে এই হালার বিষয়কে তখনকার মুসলিম শাসকরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সম্রাট আকবর তার সময়ে তার সকল ধর্মকে একত্র করে নতুন একটি ধর্ম চালু করেন। যার নাম শিখ ধর্ম, যা ইসলামের পরিপন্থী। উপরোক্ত ঘটনাই সহাবস্থানের ভিন্নধর্মী উপস্থাপনের প্রভাবের প্রকটতা তুলে ধরে। বর্তমানের সমাজব্যবস্থা দিকে তাকালে তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে যার প্রধান কারণ ধর্মীয় জ্ঞানহীনতা, পারিবারিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অবনতি। যে দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তার সংবিধান মুসলিম শরীয়া অনুযায়ী হওয়াই যৌক্তিক। এবং মুসলিমদের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একই সমাজে বসবাসের ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

ইসলামের সহাবস্থান বলতে একই সমাজে মিলেমিশে একে অপরের ক্ষতি না করে নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রেখে বসবাস করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অবশ্যই মুসলিমদের হাতে থাকতে হবে।মুসলমানদের উপর বেধর্মীদের কর্তৃত্ব ইসলামে মানানসই নয়।বরং ইসলামি শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সব রকমের সুযোগ সুবিধা গ্রহন করবে।

সহাবস্থানে অমুসলিমদের অধিকার

একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে,সমাজে অমুসলিমদের মুসলিমদের উপর নির্দিষ্ট হক রয়েছে।মুসলিম হিসেবে তাদের প্রতি আমাদের কী দায়বদ্ধতা রয়েছে, আমাদের ওপর তাদের কি কি হক রয়েছে- সহাবস্থানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার জন্য সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া জরুরী।

কুরআন ও ইসলাম এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য,তাদের মুক্তির পথ দেখাতে ,অধিকার সংরক্ষণে।তাই কুরআনে মুমিন, মুসলিমদের চেয়ে মানবজাতি (يا ايها الانسان) শব্দটি অধিক এসেছে।ইসলাম শুধু মুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলে না, ইসলাম অমুসলিমদের অধিকারের কথাও বলে। অমুসলিমদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত, এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস আমাদেরকে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবিগণদের আচরণে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। একটি দেশে বসবাসরত সকল ব্যক্তি ঐ দেশের নাগরিক বলে পরিগণিত হয়।সে যেই ধর্মেরই হোক না কেন।মুসলিম দেশও তাই, মুসলিম অমুসলিম সবাইকে দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
অমুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা কুরআনে বলেছেন,
‘দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’
-সূরা মুমতাহিনা,৮।

অর্থাৎ,কোনো বিধর্মী যদি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধীতা, ক্ষতি না করে তাহলে তাদের সাথে উত্তম সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করার উৎসাহ প্রদান করে ইসলাম।এমনকি তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।যখন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্হা মেনে অমুসলিমরা বসবাস করে তখন তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানদের উপর বর্তায়।

রাসূলুল্লাহ (স) এ বিষয়ে বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত কোনো লোককে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।[৭]’

যেহেতু একই সমাজে বসবাস করতে হয়, তাই অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক কাজকর্মে ঝরাতে হয়।আর এটি সম্পূর্ণ ভাবেই জায়েজ। অনেক সাহাবাগণ অমুসলিমের অধীনে কাজ করেছেন এবং অমুসলিমকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়েছেন। আলী (রা.) কূপ থেকে প্রতি বালতি পানি উত্তোলনের বিনিময়ে একটি করে খেজুর পাবেন, এই শর্তে ইহুদির কাজ করেছেন।[৮]

রাসূলুল্লাহ (স) অর্থ কষ্টের সময় এক ইহুদির কাছে বর্ম বন্ধক দিয়ে কিছু ঋণ এনেছিলেন।[৯] আম্মাজান আয়েশা, আলী, ও উমর (রা.) প্রমুখ অমুসলিম প্রতিবেশীর বাসায় খাবার আদান-প্রদান করতেন।[১০] বোঝা গেল, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক কাজকর্ম করা যাবে।

অন্য সকল প্রতিবেশির মতো অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে একই ভাবে সদব্যবহার ও মিলেমিশে থাকতে হবে। ইসলাম কখনোই কোনো অমুসলিমের অধিকার হরণ করার কথা বলে না। বরং মুসলমান অমুসলিমের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে এবং তার থেকে বৈধ, হালাল খাবারও গ্রহণ করতে পারবে। এই বিষয়ে হাদিস থেকে বৈধতা পাওয়া যায়।রাসূল (সা.) নিজে অমুসলিমদের ঘরে খাবার খেয়েছেন এবং অমুসলিমকে তিনি নিজে খাইয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, এক ইহুদি মহিলা নবী (সা.)-এর কাছে বিষ মিশ্রিত বকরী নিয়ে এলো। সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি খেয়েছেন।[১১]
তবে একই রাষ্ট্র,সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও ধর্ম গ্রহনের জবরদস্তি করা যাবে না। কুরআন-সুন্নাহ কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার নির্দেশ দেয় না। সমতা, শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান সবসময় বিরাজমান ছিল এবং থাকবে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করে না।

আমাদের জন্য মসজিদ পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ।তাই এর রক্ষণাবেক্ষণ করাও জরুরি।ঠিক তেমনি ভাবে আমরা অন্যের উপাসনালয় কে সম্মান ও নিরাপত্তা দিবো যাতে ,তাদের কাছ থেকে আমাদের উপাসনালয়ে কোনো আঘাত না আসে।ইসলামের বিধান হলো, ভিন্ন ধর্মের উপসনালয়ে সাধারণ অবস্থায় তো বটেই, যুদ্ধাবস্থায়ও হামলা করা যাবে না। কোনো ধর্মীয়

পুরোহিতের বিরুদ্ধে অস্ত্র নেয়া যাবে না । রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো অঞ্চলে সৈন্যদল পাঠানোর সময় বলতেন, আমি তোমাদের (কয়েকটি উপদেশ দিয়ে) প্রেরণ করছি:(যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, কারো চেহারা বিকৃত করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো গাছ উৎপাটন করবে না।[১২]

উক্ত হাদিস থেকে অনুমান করা যায় ,যে ধর্ম যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সঙ্গে এরূপ আচরণের নির্দেশ দেয়, সেই ধর্ম সাধারণ অবস্থায় এবং স্বাভাবিক পরিবেশে অমুসলিমের সঙ্গে কী ধরনের আচরণের আদেশ করে। এজন্য আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের সোনালি যুগে কোনো দেশে মুসলিম সৈন্য প্রবেশ করলে সাধারণ মানুষ স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। যুদ্ধ হতো শুধু সৈন্যদের সঙ্গে, বেসামরিক নাগরিকদের কিছুই বলা হতো না। তবু তারা ইসলাম গ্রহণ করত। কারণ তারা এর আগে দেখেছে, যুদ্ধ শুধু ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে আনে। কোনো জনপদে বিদেশি সৈন্য এলে তারা সেখানকার পরিবেশ ধ্বংস করে দিত। একমাত্র মুসলিম সৈন্যরাই ছিলেন ব্যতিক্রম। মুসলিমদের অনুপম চরিত্র দেখে ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত। বর্তমানে আমরা এর একটি প্রকৃত উদাহরন দেখতে পাই। ফিলিস্তিন-ইজ*রায়েলের অসমান অন্যায় গনহত্যায়। যেখানে শরণার্থী শিবির থেকে শুরু করে ,হাসপাতাল বিদ্যালয়ে নারী-শিশু হত্যার এক চরম অবক্ষয় তুলে ধরেছে ইহুদি এ জাতি ,তাদেরই স্বজাতি কে যখন যুদ্ধবন্দী করেছিল ফিলিস্তিনের হা*মা*স ।আর যখন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়েছে হামাস তখন তাদের প্রাণোচ্ছল হাসি দেখেই প্রমানিত হয় যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি তাদের ব্যবহার।মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের কেউ কেউ সরাসরি স্বীকার করেছে হা*মা*সের উদারতা।ঠিক অপর দিকেই ইজ*রায়েলের মুক্ত বন্দীদের জীর্ণশীর্ণ চেহারা,চোখবিহীন, বিকলাঙ্গ ফিলি*স্তিনিদের দেখলেই তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

অমুসলিমদের সাথে আচার-ব্যবহার সম্পর্কে করতে ইসলাম দেয়া নির্দেশ আমরা নবীজির ব্যক্তিগত আচরণের মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি। সুন্নাহ বা হাদিস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই , রাসূলুল্লাহ (সা.) ভিন্ন ধর্মের মানুষকে মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য সম্মান দিতেন। অমুসলিম প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচার করতেন। অমুসলিমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছে প্রিয়নবী (সা.)-এর চারিত্রিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে।
একজন কাফের নেতাকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে এনে মসজিদে নববীর খুটির সাথে বেঁধে রাখা হলো। রাসূল (সা.) এসে দেখেন, তার হাত খুব শক্ত করে বাঁধা, এতে তার কষ্ট হচ্ছে। এটি

দেখে নবী কারীম (সা.) বললেন, তার বাঁধনটা একটু আলগা করে দাও। সাহাবারা তা-ই করলেন।[১৩]

আবদুল্লাহ বিন সালাম ইহুদিদের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবী কারীম (সা.)-এরর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও মহানুভবতা দেখে প্রকাশ্যে কালিমা শাহাদাহ পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। এভাবে দলে দলে মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে।

মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার চৌকাঠে হাত দিয়ে বললেন, মক্কার লোকেরা, তোমরা আমার কাছে কী আশা কর? তারা বলল, আমরা তোমাকে ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে আশা করি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করবে। তখন তিনি বললেন, ইউসুফ (আ.) যেভাবে তার ভাইদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বলেছিলেন ‘আজ তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না’, তদ্রূপ আমিও তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।[11] যারা রাসুল (সা) এর উপর জুলুম করতে করতে হিজরত করতে বাধ্য করে ,এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যে নবীজী সা কে রাতের অন্ধকারে হিজরত করতে হয়েছিল— তাদের সঙ্গে রক্তপাতহীন ক্ষমার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নবী-রাসূল ছাড়া আর কারো মধ্যে দেখাতে পারবেন না।

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় ফিকহ গ্রন্থে। যা প্রমাণ করে অমুসলিমদের অধিকারের প্রতি ইসলাম কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।দেশে অবস্থান রত অমুসলিম ৩প্রকার । প্রথম প্রকার,যারা চুক্তি বা সন্ধির মাধ্যমে মুসলিম দেশের বসবাস করে। দ্বিতীয়ত যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। তৃতীয়ত হচ্ছে এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনভাবে দেশের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম দুই পক্ষের জন্য কিছু নিয়ম নীতি রয়েছে। সন্ধি বা চুক্তি ক্ষেত্রে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা বসবাস করে এবং একই সমাজ অবস্থায় বসবাস করার ক্ষেত্রে এক অপরের সাথে রাজনীতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংযোগ রাখতে পারে এবং বর্হিশক্তির সাথে একই সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয়।নবী করিম (স) বলেছেন, ‘যদি তোমরা কোন জাতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, বিজয়ী হও এবং সেই জাতি নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে রাজি হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে ওই পরিমাণ মুক্তিপনের থেকে এক কণাও বেশি নিও না, কেননা তা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।’[১৪]

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারা যদি জিজিয়া প্রদান করে, জিজিয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট কর, যা এখন কর্তাকে প্রদান করতে হয় আর তার বিপরীতে তাদের নিরাপত্তা দেয়া হয়। জিজিয়ার পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হলে সেই অর্থ ফেরত দেওয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ একত্রিত করে এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হয় , তখন আবু উবায়দা নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন , 'তোমরা যে সকল জিজিয়া, খাজনা মুসলিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলে তা তাদের ফেরত দাও এবং বলে দাও, আমরা তোমাদের আর নিরাপত্তা দিতে সমর্থ নই , তাই নিরাপত্তার বিনিময় আদায় কৃত অর্থ তোমাদের ফেরত দিচ্ছে।'[১৫]

ব্রিজের ক্ষেত্রেও ইসলাম সমতা এবং ন্যায়পরায়ণতা দৃষ্টান্ত রেখেছে। দিদি আর পরিমাণ হবে ওই অমুসলিমদের আর্থিক অবস্থার ওপর। ধনী গোষ্ঠীর জিজিয়ার পরিমাণ হবে বেশি, মধ্যবর্তী শ্রেণীর জিজিয়ার পরিমাণ কিছুটা কম এবং নিম্ন শ্রেণীর গরিবদের জিজিয়া অনেক কম। যারা জিজিআর মাধ্যমে দেশে বসবাস করে তারা একেবারে স্বাভাবিক নাগরিকের মত বসবাস করতে পারে অর্থাৎ তাদের জমি,সম্পদের ওপর শাসকগোষ্ঠী হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর জুলুম করবে কিংবা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে কম দেবে,তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা তার ওপর চাপাবে অথবা তার কাছ থেকে কোন জিনিস তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে— এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদি হব।'[১৬]

সম্পদের দিক থেকে অমুসলিমগণ যেই সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে ঠিক জীবনের ক্ষেত্রেও একই সুযোগ-সুবিধা পায়। মুসলমান ব্যক্তি দ্বারা বিনা ওজরে তখনো কারণ ছাড়া কোন অমুসলিম নিহত হলে তার কিসাস নিহতের রক্তের সমান।

ইসলামে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

যেহেতু শুধু মাত্র ব্যক্তিক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতের উপস্থিতি দেখা যায়,অতএব একটি সমাজে ভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তি, গোষ্ঠী সহাবস্থান করে। যেহেতু একেকজন একেক নিয়মনীতিতে বিশ্বাসী তাই মতভেদ এবং তা নিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়া স্বাভাবিক বিষয়।যেহেতু একটি সমাজে প্রায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে আর ধর্মীয় মতভেদের বিশৃঙ্খলা—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয় অহরহ।এই সমাস্যার সমাধানের অন্যতম পথ সংলাপ।কথা না বলে মানুষ যেমন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি কথোপোকথন ছাড়া আইডিয়া ডেভলপ করা যায় না। কোন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রধান ও প্রথম পদক্ষেপ আলোচনা তথা কথোপকথন। কোন বিষয়ে সমস্যা সমাধানের রাস্তাও খোঁজা হয় আলোচনার মাধ্যমে। সমস্যা তৈরির কারণ,সমস্যা প্রভাব এবং সমস্যার সমাধানের প্রভাব কতটা কার্যকরী তা একমাত্র ভুক্তভোগী,সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত আলোচনা থেকেই বের করা সম্ভব। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কঠোরতা, আড়ষ্টতা থেকেই দাঙ্গার সৃষ্টি। যেমন কোন ধর্মের রীতি-রেওয়াজ,নিয়ম সম্পর্কিত সম্প্রসারিত জ্ঞান একমাত্র ওই ধর্মাবলম্বী বা জ্ঞান সংগ্রহকারী জানবে। অন্য ধর্মের মানুষের থাকার কথা নয় এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেকে শুধু নিজ ধর্ম সম্পর্কেই কম বেশি জ্ঞান রাখে, এক্সেপশনাল হিসেবে যে সকল ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে রিসার্চ করে জ্ঞান গ্রহণ করে তারা রাখে। একটা সাধারন মানুষের পক্ষে অন্যান্য ধর্মের সাধারণ জ্ঞান রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই প্রধানত অন্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান বিহীন তর্কে যেতে বা সকল ধর্মগুরু ই নিষেধ করেছেন। যেমন একজন নাস্তিক বা হিন্দু বা খ্রিস্টান বা অন্য যে কোন ধর্মের ব্যক্তির সাথে ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কে যাওয়ার জন্যে নিজের ধর্ম সম্পর্কে ঠিক ততটুকু জ্ঞান রাখতে হবে যাতে অন্যের প্রত্যেকটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা নিজের ধর্মের আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যায়। তাই প্রধানত আমাদের সমাজে মুসলিম ধর্মে আলেম,শায়েখ তারাই এ সকল প্রশ্নের সমাধান , ব্যাখ্যা দেয় কারণ তারা ধর্ম সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞান রাখেন। যদিও ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তি একজন দায়ী,কাজেই ততটুকু জ্ঞান রাখা দরকার যাতে ইসলামকে আমরা সুন্দর মত রিপ্রেজেন্ট করতে পারি।

আলোচনার অন্যতম প্রক্রিয়া, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। আমার পূর্বে জেনেছি যে, দুই বা তার বেশি ধর্মের ব্যক্তিবর্গের মাঝে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিষয়ে আচরণগত মিথস্ক্রিয়ায় পরস্পর আলোচনা কথোপকথন এবং অভিজ্ঞতা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বলে।

মানুষ বর্তমানে স্বার্থান্বেষী হয়ে কোথায় বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে চলাচল করে।এই বেপরোয়া অবস্থায় একমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান ও ভীরুতা যেমন নেতিবাচক মনোভাবকে সংকীর্ণ করতে

পারে।তেমনি ধর্মীয় মূল্যবোধ,সহনশীলতা,শিষ্টাচার ইত্যাদি পারে অসাম্প্রদায়িক রাখতে। তবে অসাম্প্রদায়িকতার নামে সেকুলার পন্থী হওয়া যাবে না।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্মে ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের ধর্মে সৌন্দর্য ও ভেতরকার মূল্যবোধ তুলে ধরে, যার ফলে কোন নেতিবাচক ধারণা থাকলেও তা সংশোধন করা সম্ভব হয়। ধর্মীয় আন্তঃগোষ্ঠীর মধ্যে সকল সমস্যার সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা তুলনাহীন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ইসলামের মূল বাণী আহকাম আকিদা ভিন্নধর্মীদের মাঝে পৌঁছানো যায়। কুরআনে এই বিষয়ে বলা হয়েছে,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .

"তুমি তোমার প্রভু প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে প্রজ্ঞা দীপ্ত কৌশলে ও হৃদয় স্পর্শী কথার দ্বারা দাওয়াত দাও। আর তাদের সাথে বিতর্ক করবে সর্বোত্তম নীতি ও নৈতিকতায়।[১৭]

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ধর্মের উপস্থিতি রেখেছেন পারস্পারিক, বোঝাপড়া জানাশোনা, উত্তম,অনুত্তম তুলনা করার জন্য। এ বিষয়ে তিনি কুরআনে বলেন,

“হে মানুষ সকল, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবগত।”[১৮]

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে কিছু নিয়ম নীতি নির্ধারিত রয়েছে। ইসলাম যদিও সর্বোত্তম এবং একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, তদুপরি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবেনা। প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান করাই আমাদের শিষ্টাচার। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের উপস্থিতি রয়েছে।আর এরা সবাই একই সমাজে বসবাস করে।সমাজে নিয়মতান্ত্রিক, সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংলাপের বিকল্প। বর্তমানে রাজনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক ইত্যাদি সমস্যার প্রধান উদ্যোগ সংলাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ই ছিল সংলাপ,যে আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করা হতো। যদিও বর্তমানে এটি ব্যর্থ।এর ব্যর্থতার কারন নিরপেক্ষ না হওয়া, ক্ষমতাসীনদের জোট তৈরি হওয়ায় এর কার্যক্রম এখন শূন্য।

বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্ট এর কারন এই সংলাপ ।দেশের সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যস্থতার জন্য সংলাপ ব্যবস্থা–যদিও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে–এই সংসদ বা পার্লামেন্ট ব্যবস্থা। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে পরিবারের মধ্যে সকল সমস্যা সমাধানে এই সংলাপ।

বাংলাদেশে মুসলিম প্রধান দেশ।তবে এর পাশাপাশি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বসবাস করে এই দেশে। সহাবস্থান করে আসছে সেই শুরু থেকে।এদের সাথে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করতে,কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে তা দূর করতে আলোচনার বিকল্প নেই।এই সংলাপের অন্যতম প্রধান প্রয়োগ **দাওয়াত** ।আলোচনা , তর্ক-বির্তকে না গেলে একটি ধর্মের ভিতরকার সবকিছু সম্পর্কে জানা যায় না।ইসলাম উন্মুক্ত ভাবে প্রশ্ন করায়, সেই বিষয়ে আলোচনায় বিশ্বাসী।এতে পরস্পর সম্পর্কে কোনো বিভেদ,ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা নিষ্পন্ন হয়।এর মাধ্যমেই ইসলাম বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যা দূর করা সম্ভব।

দ্বীনের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে এবং নাস্তিকদের মোকাবেলায় সমাজে দ্বীনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ জরুরি।এছাড়া বিভিন্ন সংশয় , ভ্রান্তি দূর করতেও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর তুলনা নেই।

দাওয়াতি প্রয়োজনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এর ব্যবহার উল্লোখযোগ্য। ইসলাম সংলাপের গুরুত্ব ও মূল্যবোধের ব্যাপারে জোর তাকে দিয়েছে,বলেছে উত্তম উপদেশ আর সুন্দর বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত দেবার কথা। দুইজন আলাদা ব্যক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে আলোচনা। আলোচনার মাধ্যমে একজন আরেকজনের উপর চিন্তা ভিত্তিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এটা কিভাবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাঈ ও অপর ব্যক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়, যার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার চিন্তাভাবনা একজন অপরজনকে জানাতে পারে। এবং এরই মাধ্যমে দাঈ ওই ব্যক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে জানে এবং সেই সম্পর্কে নির্দেশ দিতে সক্ষম হয়।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে **সকল ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা** করা যায়।

প্রত্যেক ধর্মেই নীতি বাক্যগুলো প্রায় এক, যেমন মিথ্যা না বলা, কারো ক্ষতি না করা, অসৎ উপায় বর্জন করা, সহনশীল হওয়া এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। আর এই এতোটুকুই যথেষ্ট সমাজে সহাবস্থানের জন্য। শুধু সমালোচনা আলোচনার মাধ্যমে এ কিভাবে এক ধর্মের হয়ে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায় বা এর সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে।

ইসলামে আন্ত ধর্মীয় সংলাপের ব্যবহার প্রায় গোড়া থেকেই। অন্যান্য নবীদের মত রাসূলুল্লাহ স মদিনা সনদ,হুদায়বিয়ার সন্ধি, চুক্তি করেছেন যা মূলত দুই পক্ষের সুবিধা ও অসুবিধা কি মাথায় রেখে। ফলস্বরপ সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে ইহুদি,মুশরিক, মুসলিম একসাথে বসবাস করেছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সেখান থেকে শুরু। তবে নতুন করে ধর্মনিরপেক্ষ একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করেন। এরা কিছু থেকে কিছু বলেই ধর্মের সমালোচনা করে এর বিভিন্ন ভুল ত্রুটি বের করার চেষ্টা করে এবং মানবতার গুণাবলী দিয়ে ধর্মকে হেয় করার চেষ্টা করে। এর মূলত ধর্ম বিরোধীই নয়, ধর্ম বিদ্বেষীও। এরা বেশিরভাগই খ্রিস্টান ধর্ম তথ্য সহ হিন্দু চৈনিক এ সকল ধর্ম অধর করে যদি ইসলাম

সম্পর্কেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা কিছু গ্রহণ করত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একটু অন্যরকমই হতো। এই নতুন জেনারেশনের যুগে তা সকল ধর্মের উত্তরসূরীরাই এখন ধর্ম বিরোধিতায় বেশী উৎসুক। তাই অন্যান্য ধর্মের সকল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মীয় চিন্তাভাবনা অমূল্যবোধ সজাগ করতে কাজ করতে হবে। কোন ধর্মের বাইরে থেকে মূল্যবোধ শেখা বা চর্চা করা যায় না তাই প্রত্যেক ধর্মের ব্যক্তিকে তাদের পরবর্তী জেনারেশন কে ধর্মপন্থী ধর্মমুখী এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বর্তমান যুগের মানুষ আধুনিকতায় নিজেকে ডোবাতে ডোবাতে এতটাই তলানিতে গিয়ে থেকেছে তাদের কাছে রিলেজিয়াস তথা ধর্মমুখী হওয়া ব্যাকডেটেড বা সময়ের সাথে পিছিয়ে পড়া ফ্যাশন। যার ফলস্বরূপ নাস্তিকতার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা,অনৈতিক কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। মানুষ যখন সফলভাবে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে ঠিক তখন প্রশ্ন হয়ে উঠে আসবে এতগুলো ধর্মের মধ্যে **সত্য ধর্ম** কোনটি আর তার জন্য আমাদের দ্বিতীয়বার আন্তঃধর্মীয় সংলাপে যেতে হবে। যার মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্ম তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য তুলে ধরবে, সাথে মাহাত্ম্য। যার মাধ্যমে খুব সহজেই **সত্য ধর্ম খুঁজে পাওয়া** সম্ভব। যদিও বিষয়টা আপেক্ষিক প্রায় সব ধর্মই নিজেদের ধর্মকে সত্য ধর্ম মনে করে। ধর্ম একটি এসেছে দুনিয়াতে বারবার সেটি ইসলাম তবে সময়ের সাথে বাকি ধর্মগুলো বিকৃত হয়ে গেলেও সর্বশেষ নবী স এর প্রচার এখনো বিকৃত হয় নি । এর প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ কর্তৃক সংরক্ষিত। তাই অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় এর বিকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই ধর্মীয় তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে সত্য ধর্মকে প্রচার করার বিষয়ে খ্রিস্টান ও মুসলিমরা এগিয়ে। অন্যান্য ব্যক্তিরা ধর্ম সম্পর্কিত তর্ক বিতর্কে আসতে বিশ্বাসী নয়। পৃথিবীতে বহু ধর্ম রয়েছে তারা সবাই সত্য ধর্ম হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করে ।তাই একমাত্র আন্ত ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমেই যাচাই-বাছাই করা সম্ভব।

সামাজিক অবক্ষয় রোধের অন্যতম চাবিকাঠি সত্য ধর্মের মূল্যবোধ গ্রহণ করা। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষকে নিয়ন্ত্রিত থাকতে সাহায্য করে। যখন মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তখন তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযত হতে সাহায্য করে। সৃষ্টিকর্তা ভীরুতা তাকে শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ অনুযায়ী চলতে সাহায্য করে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ, পরিবার তথাপি নিজেকে দেখলে উন্নত সভ্য জীবন যাপন করা যায়। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে জন্য **ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচার ও উন্নয়নে** আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান সমাজের সেকুলারপন্থী দার্শনিক গন ধর্মের বাইরে থেকে মানবিক নৈতিকতার প্রকাশ করে থাকেন। বহু পূর্ব থেকে সামাজিক গবেষণা থেকে জানা যায় নৈতিকতা কার্যকর করতে হলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনার বিকল্প নেই। একটি ধর্ম একজন ব্যক্তিকে উত্তম হিসেবে তখনই প্রকাশ করে যখন তার মধ্যে সততা, বিনয় ,উদারতা ,সংযম, সহনশীলতা,ভারসাম্যপূর্ণ

হওয়া, মিতব্যায়িতা,সাহসিকতা, স্থিরতা,শোকর গোজার হওয়া, চরিত্রবান হওয়া, বিনয়ী হওয়া,ধৈর্যশীল হওয়া, দানশীল হওয়া ইত্যাদি নৈতিক গুন থাকে। আরে ছাড়া সমাজে কোন ভাবে উত্তম ব্যক্তির উপর আত্মপ্রকাশ করা যায় না।

যেমন কোন বেধনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কোন যুক্তি তর্ক করতে গেলে আগে আমাদের সাদৃশ্যগুলো যেগুলো উভয় দিক থেকে সামাজিক রাষ্ট্রীয় ভাবে উত্তম তুলে ধরা যায় এতে দুইজনের ধর্মের উত্তম দিক উঠে আসে। প্রথমে নিরশন হয় বিভ্রান্তি এই ধর্মের প্রতি। তারপর আলোচনার মাধ্যমে সমাজের শৃঙ্খলা আনার দৃষ্টিভঙ্গিদের পথ সুগম হয়।

এইভাবে মূল্যবোধ তৈরি করতে গেলেই প্রত্যেক ধর্মের প্রতি **সৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়** ।

সহাবস্থানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবহার

সমাজে একই গণ্ডিতে ভিন্ন মতের মানুষ একসাথে বসবাস করতে হলে তাদের মধ্যকার বোঝা পড়া, চিন্তাভাবনায় মধ্যস্থতা থাকতে হবে। যেমনটা অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে। কোন সমস্যা সমাধানে দলীয়ভাবে ঐক্য সংগঠন তৈরি করে সেই বিষয়ে গবেষণা পর্যালোচনা করা যা এক পর্যায়ের সংলাপ।

ইসলামে এর ব্যবহার অনেক পূর্বে থেকে দেখা যায়।

আমরা সবাই ঐতিহাসিক **মদিনা সনদে**র কথা জানি। রাসূল (সা.) যখন মক্কা থেকে মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মদীনায় ইহুদি, পৌত্তলিক, অগ্নিপূজকসহ বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মানুষ ছিল। নবীজি মদীনায় এসে সর্বপ্রথম তাদের সাথে সহাবস্থানের চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তিটাকেই আমরা মদীনা সনদ হিসেবে জানি। চৌদ্দশ বছর আগের মদীনা সনদ আজও পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিক। এখনো পৃথিবীর রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ নবী কারীম (সা.) প্রবর্তিত ঐতিহাসিক মদীনা সনদের ধারাগুলো নিয়ে গবেষণা করেন এবং প্রশংসা করতে বাধ্য হন। মদীনা সনদের একটি ধারা ছিল— প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং মদীনা রাষ্ট্রকে হেফাজত করবার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করবে। মুসলমানদের ওপর বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে মুসলমানদের পক্ষ হয়ে ইহুদিরা লড়বে, ইহুদিদের ওপর আক্রমণ হলে মুসলমানরা মদীনা রাষ্ট্রকে হেফাজত করবার জন্য ইহুদিদের পক্ষ হয়ে বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করবে। এরকম আরো অনেক চুক্তি ছিল, যেগুলো থেকে বোঝা যায়, যে ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্ম-গোত্রের মানুষ একত্রে বসবাস করে, সেখানে নিরাপত্তার ক্ষেতে একে অন্যের সহযোগী হবে।

মদিনার সনদে মদিনার অন্য সকল বাসিন্দা এবং মুসলিম গোষ্ঠীর সাথে সাম্য রেখে তৈরি করা হয়। অর্থাৎ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রভাব এখানে দেখা যায়।

ইসলামে সহাবস্থানের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরো অনেক পদক্ষেপ থেকে পাওয়া যায়। মদিনায় হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদিনার মুসলিম সমাজকে পারস্পারিক আস্থা ও বিশ্বাস এবং পরিছন্ন নিয়ম শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে রাসূল (সা) সক্ষম হন। তবে মদিনার মুসলিম গোষ্ঠীর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী ছিল ইহুদিরা। ইহুদিরা সবকিছুর ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও সামনাসামনি তার প্রকাশ করতো না। রাসুল (স) তাদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, জাতের তাদেরকে জার্মানের নিরাপত্তা ও ধর্ম কর্ম স্বাধীনতা

প্রদান করা হয় । এ চুক্তির কিছু উল্লেখযোগ্য ধারা থেকে আমরা সমসাময়িক ইসলামে সহাবস্থানের প্রধান প্রয়োগ ব্যবহার বুঝতে পারি।

যেমন একই সমাজে ইহুদিরা এবং মুসলমানরা মিলে মিশে বসবাস করবে এবং যে যার ধর্ম পালন করবে। এ থেকেই বোঝা যায় সহাবস্থান বলতে মিলেমিশে থাকা এবং যে যা ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, ধর্ম একত্রিত করা কে নয়। এই চুক্তির অন্যতম একটি ধারা হচ্ছে চুক্তির আওতাধীন কোনও পক্ষের সাথে অন্য কোন পক্ষের দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ হলে চুক্তিতে আওতাভুক্ত অন্যান্য সকলপক্ষ সম্মিলিতভাবে তার সাথে যুদ্ধ করবে। এই ধারা থেকে আমরা বুঝতে পারি মিলেমিশে থাকার অন্যতম কারণ প্রত্যেকটি নিরাপত্তা দেওয়া। ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও একই সমাজের অংশ হিসেবে নিজেদের একত্রিত করা এবং এক হিসেবে গণ্য করা। সকল বর্হিশক্তির বিরুদ্ধে একত্র হয়ে মোকাবেলা করতে হবে। চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি সদিচ্ছা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে কাজ করে যাবে কোন অন্যায় পাপাচারের ভিত্তিতে নয়, এ ধারাতে সমাজের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যকার পারস্পরিক সহানুভূতি সম্পূর্ণ ভাই সুলভ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই ভাই ভাই যার সঠিক ব্যবহারের কথা এই ধারাতে বলা হয়েছে। তবে একই সমাজের ভিন্ন দলের দ্বারা সংঘটিত কোন অন্যায়ের দায় সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ অন্যায়কে অন্যায়কারী হিসেবেই বিবেচনা করা হবে কোন গোষ্ঠীর পরিচয়ে নয়। সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে একটি অন্যতম ধারা হিসেবে রাখা হয়েছিল যে সমাজের চুক্তিভুক্ত গোষ্ঠীদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে তার মীমাংসা করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল। অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর ইহুদিদের কর্তৃত্ব নেয়া যাবে না, আর ন্যায় সংগত কারণেই ইহুদিদের সে সম্পর্কে কোনো দ্বিমত থাকবে না। কারন ইসলাম সবসময় সঠিক,নির্ভুল ও উত্তম বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। সর্বশেষ ধারা অনুযায়ী কোন অন্যায়কারীর জন্য এই চুক্তি সহায়ক হবে না বলে ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ অন্যায়কারী যেই পক্ষেই হোক না কেন হোক সে ইহুদি বা মুসলমান তার জন্য একই বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এখানে বিচারের ক্ষেত্রে কতটা নিরপেক্ষতা অনুসরণ করা হয় যার ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নির্দ্বিধায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতায় বসবাস করেএই বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ইসলামে সহাবস্থানের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আলোচনা এক ঐতিহাসিক ও বিশেষ চুক্তি বা সন্ধিকে আমরা দেখতে পারি। **হুদায়বিয়ার সন্ধি**—ইসলামের ইতিহাসে মোর পরিবর্তনকারী ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি—মুসলিমদের জন্য বিজয়। আরব উপদ্বীপের অবস্থা যখন প্রায় সবখানে মুসলমানদের অনুকূলে এসে গেল তখন ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতার ও বৃহত্তম বিজয়ের বিভিন্ন নিদর্শন ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করতে থাকলো। মুশরিকরা ছয় বছর

মসজিদুল হারামের দরজা মুসলমানদের জন্য বন্ধ রেখেছিল। এই সন্ধির পর মুসলমানদের ইবাদত বন্দেগীর ইতিবাচক ডাবের প্রক্রিয়ায় শুরু হয় মসজিদুল হারামে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, স্বপ্নে দেখেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন, কাবা গৃহের চাবি গ্রহণপূর্বক সাহাবায়ে কেরামসহ আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেন এবং ওমরা পালন করেন। এ তখনই ধারণা করেন আল্লাহ তায়ালার রহমতে শীঘ্রই তারা মক্কার প্রবেশাধিকার লাভ করবেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি মক্কার দিকে গমন করার জন্য ঘোষণা দেন এবং চৌদ্দশত/পনেরোশত সাহাবা নিয়ে রওনা দেন। তবে মক্কার কুরাইশ সম্পর্কে জানতে পারলে তারা পরামর্শ নেন যে, কোনভাবেই আল্লাহর ঘরে মুসলমানদের প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধ করতেন না গেলেও মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করেন। পথিমধ্যে হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে ঝর্ণা কাছে পানির জন্য বিরতি নেন। সে সময় সেখানে বুদাইলবিন ওয়ারাকার এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'ব বিন লুওয়াই সম্পর্কে অবহিত করেন।যে কিনা যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিলো। এরি প্রেক্ষিতে একসময় এ পক্ষ এবং ওই পক্ষের মধ্যে কথা আদান-প্রদানের জেরে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে রাসুল সাঃ কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন ভ্রমণ উদ্দেশ্য বর্ণনা করার জন্য। তিনি কোন যুদ্ধ করার জন্য আসেননি এটি জানাতেই মূলত উসমান রাঃ কে প্রেরণ করেন। ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরাইশদের এটি জানানোর পর তারা তাকে আটকে রাখেন এই কারণে যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার একটা দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন তাই তারা সময় নিচ্ছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফেরত যেতে সময় বিলম্ব হওয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এরপরের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবেন তা না হলে এই জায়গা পরিত্যাগ করবেন না। এবং সাহাবীদের কেউ অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। পরবর্তীতে কুরাইশরা পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এবং অনতিবিলম্বে সোহাইল বিন আমরকে সন্ধি চুক্তির ব্যাপারে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলেন। সাথে শর্ত দিলেন যেই বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ওমরা করতে পারবেন না। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির দফা সমূহ ধার্য করা হয়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এরকম যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে, অস্থিতিশীল পরিবেশকে স্থিতিশীল করার জন্য তারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পথ গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষের উপস্থিতির মাধ্যমে চুক্তি দফা সমূহ গ্রহণ করা হয় যদিও এতে আপেক্ষিক ভাবে দেখা যায় মুসলমানদের কেও করা হয়েছে। তারপরেও এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা গেল অনেকটা এরকম।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাম মক্কায় প্রবেশ না করেই তার সাহাবীদের নিয়ে মদিনায় ফিরে যাবেন আগামী বছর মক্কায় আগমন করবে তিনদিন অবস্থান করবেন এবং সফরে প্রয়োজনে অস্ত্র থাকবে তবে তরবারি কোষবদ্ধ থাকবে।
- দশ বছর পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এ সময় লোকজন নিরাপদ থাকবে কেউ কারো গায়ে হাত উঠাবে না।
- যে সকল গোত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অঙ্গীকারে প্রবেশ করতে চাইবে করতে পারবে, যে গোত্র যে দল অংশগ্রহণ করবে, তাকে উক্ত দলের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে , এরুপ ক্ষেত্রে কোন গোত্রের ওপর অন্যায় অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের ওপর অন্যায় করা হয়েছে গণ্য হবে।
- কুরাইশদের কোন লোক অভিভাবকের উন্নতি ছাড়া মোহাম্মদের দলে যোগদান করতে পারবে না তাকে ফেরত পাঠাতে হবে, মুহাম্মদের দলভুক্ত কোন লোক আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পালিয়ে কুরাইশদের তাদের ফেরত দিবে না।

চুক্তির সময় সোহাইল পুত্র আবু জান্দাল, যে কিনা নিজে নিজেই মুসলিমদের দলে শামিল হয়েছে, তাকে চুক্তির ভেতরে রেখে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়। চুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ধৈর্য ধরার জন্য বলেন।
তারপর অনিচ্ছা সততা রাসুল সাঃ এর নির্দেশে সবাই যার যার পশু জবেহ করে এবং মাথা মুন্ডন করে নেন।

বাহ্যিক গত দৃষ্টিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানজনক হলেও বাস্তবে এটি মুসলমানদের জন্য একটা বিশাল বিজয় স্বরূপ। কারণ এর পূর্বে কুরাইশরা ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব স্বীকার করত না, এদের নিশ্চিহ্ন করার বদ্ধ পরিকর ছিল। এছাড়া কুরাইশদের নিকট পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের অতীতের অবস্থা এবং অবস্থানে তেমন কোন সচেতনতা যেন ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের ভূমিকা যে ছিল শীর্ষস্থানে একথা তারা প্রায় ভুলে বসে ছিল। আরব উপদ্বীপের সকল মানুষ যদি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তাতে যেন তাদের মাথাব্যথা ছিল না আর এই জন্য তারা কোন প্রতিবন্ধকও হবে না। কুরাইশদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সংকল্পের দিক থেকে এটি তাদের জন্য পরাজয় কি ছিল না? অন্যদিকে মুসলমানদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্য এটি তাদের সুস্পষ্ট বিজয় ছিল। ইসলাম চাইছিল জনসম্মুখে স্বাধীনভাবে ইসলামের প্রচার মুসলমানদের স্বাধীনতা এবং এই

বিষয়ে ক্ষমতা যার জন্য তারা দীর্ঘ সময় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে আসছিল। এখানে স্বাধীনভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যক্তি কাজ করবে। যেমন যে মুসলমান হতে চাইবে সে মুসলমান হবে, যে কাফের থাকতে চাইবে সে কাফের থাকবে। আর ইসলাম কখনো জোরজবরদস্তিতে বিশ্বাস করে না।

সুতরাং সহাবস্থানের ক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবহার কতটা গুরুত্ব বহন করে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হুদায়বিয়ার সন্ধি।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, মক্কা বিজয়ের পরও রাসূলুল্লাহ (স) মাধ্যমে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমঝোতা রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী বিধর্মী দেশের প্রধানের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে সংলাপ চিঠি বিনিময় মাধ্যমে করে থাকেন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে **সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ** করা যায়। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মান মর্যাদা হানি করলে সমাজ উত্তেজিত হয়ে ওঠে ধর্মীয় কোলাহলে। এক পর্যায়ে ক্ষমতা নবী অনেক রাজনৈতিক লোকেরা উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে তাদের নেতৃত্ব কার্যকর ও জনপ্রিয় করার চেষ্টা করে। যা আমরা প্রায় আমাদের বাংলাদেশের সমাজে দেখতে পাই। গত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর পরই দেশের ভেতরে হিন্দু মুসলিম অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা চলে। অথচ কোন ধর্ম এ ধরনের অযৌক্তিক দাঙ্গাকে সমর্থন করে না। বরং ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এজন্য বিভিন্ন ধর্মের নির্দেশনা সম্মিলিত বিভিন্ন আলোচনার দ্বারা অনুষ্ঠিত আন্ত ধর্মীয় সংলাপ সমূহ উপরোক্ত সামাজিক সমস্যা সমাধানের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। তাই আন্দোলনের সংলাপের মাধ্যমে সহাবস্থানে বসবাসরত প্রত্যেকের মধ্যকার **পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও উদারতা প্রদর্শন** আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ওয়াহদাতুল আদিয়ানা

"**ওয়াহদাতুল আদিয়ানা**" (Wahdatul Adyan) বলতে "সকল ধর্মের ঐক্য" বোঝানো হয়, যা একটি ধারণা যে সমস্ত প্রধান ধর্ম একই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ করে বা একই সত্যের বিভিন্ন পথ। এটি একটি আধুনিক আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ধারণা এবং এটি "ওয়াহদাতুল উজুদ" (Wahdatul Wujud) থেকে আলাদা, যা একটি সূফী মতবাদ যার অর্থ "অস্তিত্বের ঐক্য" এবং এই মতানুসারে ঈশ্বর ও সৃষ্টি অভিন্ন।(নাজু বিল্লাহ)
ওয়াহদাতুল আদিয়ানা, এটি একটি আন্তঃধর্মীয় ধারণা যে সব ধর্মই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একটি পথ এবং তাদের মধ্যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে। এটি মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। যা সম্পূর্ণ ভুল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিকতার ছোঁয়া, তথা modern religious thoughtথেকে নতুন ধর্ম অথবা ধর্মের বিকৃতি।
ওয়াহদাতুল উজুদ, এটি একটি ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা যেখানে বলা হয় যে একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বই বাস্তব এবং জগতের সবকিছু সেই এক অস্তিত্বের প্রকাশ। এই মতবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা অভিন্ন, যা অনেক ইসলামি দৃষ্টিতে কাছে ভুল বা কুফরি বলে বিবেচিত হয়।
ওয়াহদাতুল আদিয়ানা এই ধারণাগুলির থেকে আলাদা,তবে ওয়াহদাতুল আদিয়ানা সঠিক পথ নয় বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সঠিক ব্যবহার নয়। বরং এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নামে বিভ্রান্ত করার একটি পথ। মূর্তি পূজা করে কখনো এক আল্লাহর পথ পাওয়া যায় না, আল্লাহর প্রেরিত নবী কে সৃষ্টিকর্তা ভেবেও আল্লাহর রাস্তায় আগানো যায় না। এজন্য আকিদা ও ঈমান দুইয়ের প্রয়োজন ।

বর্তমানে ধর্মীয় দিক থেকে সচেতন ব্যক্তিরা জানেন যে, ইসলামের দুশমন ও চক্রান্তকারীরা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সময়ে সময়ে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিধ্বংসী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে। এগুলোর অন্যতম অংশ হলো, ‘ওয়াহদাতুল আদইয়ান’ (وحدة الأديان) তথা **‘সর্বধর্ম মিলন’** মতবাদ। এটাকে কখনো বলা হয়, ‘তাওহীদুল আদয়ান’, তথা সকল ধর্মের ঐক্য, ‘ওয়াহদাতুদ দ্বীনিল ইলাহী’ তথা ঐশি ধর্মসমূহের ঐক্য, ‘ওয়াহদাতুল কুতুবিস সামাবীয়্যাহ’ তথা আসমানি কিতাবসমূহের ঐক্য ইত্যাদি।

যে নামেই বলা হোক না কেন, এ মতবাদের আকীদা-বিশ্বাস ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কেননা এর প্রবক্তাদের চিন্তা-চেতনা হলো, কোনো ধর্মকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা যাবে

না বা অগ্রহণযোগ্য বলা যাবে না। বরং পৃথিবীর সকল ধর্ম সত্য, এক ধর্ম অন্য ধর্মের চাইতে কোনো অংশে কম নয় এবং মর্যাদার দিক থেকে সব ধর্মই সমান। যার সারকথা হলো, ইসলাম ধর্মও সঠিক, অন্য ধর্মও সঠিক (নাজু বিল্লাহ)। এটা যে স্পষ্ট কুফর, তা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং কোনো আলেম তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও যদি ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম বাতিল মনে না করে, তার ঈমান থাকবে না।

যতদূর জানা যায়, "সকল ধর্মই হক ও সঠিক এবং ধর্মের দৃষ্টিতে আসমানী কোনো ধর্মেই কোনো বিবেদ নেই।" ইহু*দিদের চটকদার এই ঘৃণ্য চক্রান্তে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম বিশ্বে এই কুফরী মতবাদ প্রচার করা হয়। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে হেফাজত করুন। সকল ধর্মকে সঠিক কখনোই বলা যাবে না, প্রত্যেক ধর্ম মানুষকে যা শেখায় তা অনেকটা একই রকম। অর্থাৎ এদের মূল্যবোধ প্রায় একই। একজন উত্তম ব্যক্তি হতে হলে যে সকল গুনাবলির দরকার, এ সকল গুনাবলী প্রায় সকল ধর্মের জন্যই এক। এর চেয়ে বেশি অর্থাৎ ধর্মীয় মূল্যবোধের বাইরে প্রত্যেক ধর্মের সত্যতা একই বলা সম্পূর্ণ কুফর।

আর ‘ আসমানি কিতাবসমূহের ঐক্য’-এর স্লোগান ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। কেননা:

প্রথমত: বর্তমান ইসলাম ধর্ম ও ‘আল-কুরআন’ ব্যতীত অন্য ঐশি ধর্ম ও আসমানি কিতাবসমূহ বিকৃত ও পরিবর্তিত। (সবিস্তারে জানতে দেখুন, বাইবেল বিকৃতি: তথ্য ও প্রমাণ, মাওলানা আব্দুল মতিন; খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ, মুফতী তাকী উসমানী; বাইবেল কি আল্লাহর বাণী, আহমদ দিদাত; পবিত্র বাইবেল: পরিচিতি ও পর্যালোচনা, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.)

দ্বিতীয়ত: বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন ও ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পর পৃথিবীর সকল ধর্ম বাতিল ও রহিত হয়ে গেছে।

হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এ উম্মতের যে কেউ আমার ব্যাপারে শুনেছে, সে ইহুদি হোক আর খ্রিষ্টান

হোক, অথচ আমি যেই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, এর ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।’[১৯]

এরই একটি অংশ হিসেবে ‘**হিওয়ারুল আদিয়াইন**’ (حوار الأديان) বা ‘ইন্টারফেইথ (interfaith) ডায়ালগ’ তথা ‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ’ গ্রহণ করা হয়েছে। এটাকে ‘আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি’ বা ‘আন্তঃধর্মীয় ঐক্য’ও বলা হয়।
কেউ কেউ ‘ইন্টারফেইথ’ মানেই ‘ওয়াহদাতুল আদইয়ান’ বা ‘সর্বধর্ম মিলন’ মনে করে। ফলে ইন্টারফেইথে কেউ অংশ নেয়া মানেই তিনি সব ধর্ম মিলিয়ে এক ধর্ম বানাতে চাচ্ছেন এমন মনে করে, অথচ ব্যাপারটা এমন না।

এ ধরনের সংলাপের ব্যাপারে মূলকথা হলো, স্থান-কাল-পাত্র এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে এর বিধান নির্ণীত হবে।
এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের বিধান রয়েছে এবং মুসলমানরাও তা বিশ্বাস করে। কাজেই এ ধরনের সংলাপ যদি এ জাতীয় কোনো কারণে হয়, তাহলে এতে অংশগ্রহণে দোষের কিছু নেই।

কিন্তু বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। কারণ, এ ধরনের সংলাপে অংশগ্রহণকারী মুসলিম স্কলাররা নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারেন না। বরং কেউ কেউ ইনিয়ে বিনিয়ে অস্বীকৃতি, বিকৃতি বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেন। এমনকি বিধর্মীরা ইসলাম বিরোধী কিছু বললে, তার প্রতিবাদ বা এ ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও অবস্থান সুস্পষ্ট করতে পারেন না।
যেমন আন্তঃধর্মীয় সংলাপের এক অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি পরপম্পরের সম্প্রীতি ঠিক রাখার দাবী জানিয়ে জুমার দিন প্রতিটি মসজিদের মিম্বার থেকে সকল ধর্মের ভালো দিকগুলো আলোচনা করার আহবান জানান। অথচ মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণকারী এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

এ ধরনের সংলাপের আরো কিছু বাস্তবতা হলো:

১. ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে ইকদামী জিহাদকে অস্বীকার করা হয় কিংবা জি*হাদ বা ইসলামের অন্য কোনো কঠোর বিধানের অপব্যাখ্যা করা হয়।

এর কারণ হিসেবে বলা হয়, সকল ধর্মের মৌলিক শিক্ষায় কোনো উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি নেই। তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মানে আমাদেরকে প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে। এখন শান্তি ও সম্প্রীতির সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রচলিত হিউম্যান রাইটসের মতবাদকে মূল বানানো হয়। ফলে অনেক সময় ইন্টারফেইথ জি*হাদকে স্বীকৃতি দেয়ার বদলে উগ্রতা বলে দেয়। কাজেই ইন্টারফেইথ যখন বলে, সব ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ধর্মের পাবন্দ হলেই দুনিয়া থেকে উগ্রতা ও হানাহানি দূর হবে, তা ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

২. শিক্ষাক্রমে সব ধর্ম রাখার প্রস্তাব রাখা হয়।

৩. সূক্ষভাবে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাফেরদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রজেক্টে অংশগগ্রহণ করে কাফেরদের দালালীতে নাম লিখাতে বলা হয়।

৪. ‘লাকুম দ্বীনুকুম ওলিয়া দ্বীন’ বলে সকল ধর্মের স্বীকৃতি বা প্রত্যেক ধর্মই সঠিক হওয়ার কথা শুনা যায়। আবার কখনো অন্য ধর্মগুলোর কুফর সম্পর্কে অস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয়।

৫. ইহুদী-খ্রিস্টানরা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তা অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়।

৬. কোনো মুসলিম কখনোই কাফেরকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে না পারার কথা চেপে যাওয়া হয়।

সর্বোপরি কাফেরদের প্রতি মুসলিমদের স্বভাবজাত ঘৃণা যে ঈমানের অংশ, তা এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তর থেকে শেষ করে দিয়ে তাওহীদ-শিরক একাকার করে ফেলার এবং ঈমান-কুফরের সীমানা মুছে দেওয়ার আয়োজন করা হয়।[২০]

উপরে উল্লেখিত বিষয় থেকে আমরা আন্ত ধর্মীয় সংলাপের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো পৃথক করতে পারি।

সম্প্রীতির নাম করে ইউনিটি নষ্ট করা, যাতে ঔপনিবেশিক দখলদার কাফেরগোষ্ঠী এবং তাদের স্থানীয় এজেন্ট মুসলিম নামধারী তাগুতদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা অস্ত্র না ধরে।

তদ্রূপ যারা আল্লাহর যমিনে ইসলামের হারানো বিজয় ফিরিয়ে আনার জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ডাক দেবে তাদেরকে সম্প্রীতির দুশমন, উগ্রবাদী, জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে তাদের ওপর দমন পীড়ন চালানো যায়। এভাবে দুই দিক থেকে তারা জিহাদ দমনের প্রয়াস পাবে:

ক. যারা সংলাপের প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় পড়ে মানবধর্মে বা ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী হয়ে পড়বে বা অন্তত যারা সন্দিহান ও শিথিল হয়ে পড়বে তারা ইসলাম ও মুসলানদের পক্ষে কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না।

খ. যারা ইসলামী আকিদায় অটল অবিচল থাকবে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ডাক দেবে তাদেরকে সম্প্রীতির দুশমন ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে দমন পীড়নের বৈধতা পাবে।

এভাবে মুসলিম ভূমিগুলোতে তাদের দখলদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে। বিনা বাধায় মুসলিমদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যেতে পারবে, মুসলিমদের গোলামীতে আবদ্ধ রাখতে পারবে।
এজন্য আপনি দেখবেন, যতগুলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে মোটামুটি সবগুলোতেই জঙ্গিবাদ বিরোধী ইস্যু বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
এর আরো একটি প্রমাণ, যারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপে আমন্ত্রিত হয়, ট্রেনিং নেয় বা এ মতবাদ বিস্তারে কাজ করে তারা সব সময়ই জিহাদের বিরোধীতা করে আসে। বিভিন্নভাবে তারা একাজটি করে। যেমন:

- জিহাদের জন্য আজগুবি শর্ত আরোপ করে ও সংশয় ছড়ায়। যেমন জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া জিহাদ হারাম, শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলে জিহাদ হারাম, নফসের জিহাদ বড় জিহাদ, আত্মশুদ্ধি না হলে জিহাদ করা যাবে না ইত্যাদি।
- তাগুত শাসকদের আনুগত্য ফরয এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হারাম ফতোযা দিয়ে বেড়ায়।
- মুজাহিদদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী, খারিজি, তাকফিরি ইত্যাদি মন্দ বিশেষণ লাগিয়ে বিভৎসরূপে তুলে ধরে। আলকায়েদা তালেবানসহ হকপন্থী মুজাহিদদের জিহাদকে হারাম ফতোয়া দিয়ে এবং তাদেরকে জঙ্গি সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি বদ ধারণা সৃষ্টির পায়তারা করে।

প্রথমত আমরা যদি জিহাদ সম্পর্কে বিবেচনা করি। জিহাদের মূল বিষয়টি আমাদের তুলে ধরতে হবে সংলাপের মাধ্যমে। যখন অন্যান্য ধর্মের লোকেরা জিহাদকে উগ্রতা বলে দাবি করেন, তখনই জিহাদের মাহাতো এবং এর কারণ,নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জানাতে। বর্তমান বিশ্বে আমরা লাগাতার কোন কারণ ছাড়াই মুসলমানদের ওপর যে গণহত্যা চলছে তার প্রেক্ষিতে যদি বর্ণনা করি জিহাদ এমন কিছুই নয়। ইসলামের ওপর যখন হামলা হয়, এবং অন্যান্য পথ যেমন আলোচনা, সন্ধিবা চুক্তি , ইসলামী আইন বা বিচার মানার জন্য প্রস্তুত থাকে না ।তখনই আমাদের জন্য জিহাদ আবশ্যক হয়। তথাকথিত হিউম্যান রাইটস যদি নিজেদের ডিফেন্ড করার জন্য গণ*হত্যা (Genocide)কে বৈধতা দেয় তবে ।মুসলমানদের নিজেদের রক্ষার্থে জিহাদ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এবং এটি কোন দিক থেকেই উগ্রতা নয়। যদিও বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের ফাঁদে পড়ে অনেক আলেম একে উগ্রতা বলে। যার ফলে মুসলিম বিশ্বের এই প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে আফ্রিকার সুদান,সোমালিয়া ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে মুসলমান রা নির্যাতিত। জিহাদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।
কোরআনে বলা হয়েছে,
"তোমাদের ওপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে পছন্দ করছো, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।”[২১]

তবে তাদের তথাকথিত সুশীলতার মুখোশধারী গত*হত্যা থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক। নারী শিশুর ক্ষেত্রে ছাড়, ধর্মগুরু দের বিষয়ে ছাড়,পরিবেশ বিষয়ে ছাড় আরও অনেক নিয়ম রয়েছে যা তথা কথিত সুশীলরা জানলেও না।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
"আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না: আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"[২২]

তাই জিহাদকে উগ্রতা হিসেবে ঘোষণা করার আগেই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এ সকল বিষয় সংলাপে তুলে ধরতে পারি।

শিক্ষাক্রমে সব ধর্ম ও রাখার ক্ষেত্রে একটি শর্ত রাখা যেতে পারে যে, যে সকল ধর্মের অনুসারীরা সেই সকল ধর্ম সংশ্লিষ্ট বই পাঠ্যবই হিসেবে পাবে।যেমনটা বাংলাদেশে বহু পূর্ব থেকে চলে আসছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর ধর্ম বই ইসলাম শিক্ষা, হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর ধর্ম বই হিন্দু শিক্ষা বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান।

আন্ত ধর্মীয় সংলাপে একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করার পূর্বে সে সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করতে হবে। কারণ ঘাটতি আমাদের জ্ঞানে থাকতে পারে ইসলামে নয়। কিন্তু যেহেতু আমরাই ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করব তাই সেই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নিয়ে তবে আলোচনায় বসতে হবে যাতে কোন কারণে ইসলাম যে হেয় করতে না পারে। এবং ঈমানী দিক থেকে আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস শক্তিশালী হতে হবে। যেটি ধর্মীয় দিক থেকে নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে 'না' বলতেই হবে। সদাচারণ দেখিয়ে হারামকে হালাল করা যাবে না।
সকল ধরনের উপস্থিতি নিয়ে কুরআনকে সামনে রাখলে তার তাফসীর ব্যাখ্যা করতে হবে। আমরা জানি কোরআন সকল ধর্মের উপস্থিতি কথা বলেছে তার শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈধতার সম্পর্কে কিছু বলেনি বরং ইসলামে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে অন্য সকল ধর্মের বাতিল হওয়া সম্পর্কে। আন্তঃধর্মীয় সমালোচনা শুধুমাত্র একই সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে যে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থাকা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ধর্মের সত্যতা নিয়ে নয়, আর ধর্মীয় সত্যতা নিয়ে যে সকল তর্ক বিতর্ক হয় তা হবে ইসলাম প্রচারে জন্য।

একই সমাজে মুসলমানরা ইহুদী-খ্রিস্টান হিন্দুদের সাথে বসবাস করবে। যেহেতু সবাই সামাজিক প্রাণী, সবাই একই দেশের নাগরিক , সবাই মানুষ সেই খাতিরে। এখানে প্রত্যেকে যে যার ধর্ম তার নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে পালন করবে। ধর্মীয় সম্মান সবাইকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়ার মাধ্যমে করা হয়। তবে সবাই জান্নাতি বা তাদের পরকাল সম্পর্কিত বিষয় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকতে হবে। তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে তার মানে এই নয় আমরা স্বীকার করব যে তারা জান্নাতে যাবে, কেননা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনলে কোনোভাবেই জানাতে প্রবেশ করা যাবে না।
একই সমাজে একই স্কুলে বসবাসের ক্ষেত্রে আমরা পরস্পর পরস্পরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করি। তবে এ সকল বন্ধুদের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। আমরা যেমন একই ক্লাসরুমে পাঠরত সবাই বন্ধু নয়, কিছু আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকে বাকিরা আমাদের সহপাঠী। ঠিক তেমনি সমাজেও সবাই আমাদের বন্ধু নয় সবাই আমাদের প্রতিবেশী অথবা শুভাকাঙ্ক্ষী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভিন্ন। এই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে কখনো বিধর্মীকে গ্রহণ করা যাবে না। তবে বন্ধু না হলেও সে শত্রু সেই মনোভাবও মুসলমান পোষণ করে না, যতক্ষণ না তারা আমাদের ও আমাদের ধর্মের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।
সব ধর্ম এক,বা সর্বধর্ম মিলন,এরকম ভ্রান্তির উদাহরণ হিসেবে সম্রাট আকবরের সৃষ্ট শিখ ধর্মকে দেখতে পারি। তিনি নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য, আরো প্রভাবিত করার জন্য,

সকল ধর্মের মানুষের মন জুড়িয়ে চলার জন্য সবার ধর্মকে একত্রিত করে এছাড়া অনেক রাজা-মহারাজারা শাসকরা মানুষের পছন্দ অনুযায়ী তাদের ধর্মের আইনে শিথিলতা এনে দিয়েছে। আবার অনেকে পছন্দ মত তার ধর্মে বিভিন্ন নিয়ম ঢুকিয়ে নেয়। যার ফলে ধর্ম ধীরে ধীরে বিকৃতির পথে চলে যায়।

আহলে কিতাব তাদের ধর্ম বিকৃত করে ফেলেছে। আল্লাহর কিতাবে নিজেদের সুবিধামতো সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। ফলে বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিলকে হুবহু আল্লাহর নাযিলকৃত বলা যায় না। আল্লাহ তাআলা অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন। যেমন,

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"তবুও কি তোমরা (হে মুসলমানরা) আশা করছো যে, ওরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ ওদের একটা দল তো এমন ছিল যে, আল্লাহর বাণী শুনত এরপর বুঝেশুনে তা বিকৃত করতো। অথচ ওরা জানতো (যে, ওরা অন্যায় করছে)।"

–সূরা বাকারা (২) : ৭৫

যেমনটা খ্রিস্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম এমনকি হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ আলোচনা-পর্যালোচনা করলে দেখা যায় , মূর্তিপূজার পক্ষে- বিপক্ষে কিছু অস্পষ্ট বিষয়বস্তু দেখা যায়। যদিও তো এখন প্রমাণ করা সম্ভব নয় কারণ অনেক বিকৃত ধারা চিন্তাভাবনা নিয়মকানুন এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

তবে আমাদের এই "সর্বধর্ম মিলন" এর সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই। এটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী,ইসলামিক চিন্তাভাবনার সাথে সাংঘর্ষিক। আমাদের ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রধান উদ্দেশ্য বা পদ্ধতি মূলত প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান জানিয়ে একই সাথে সমাজে বসবাসের নিয়ম বের করা। যে নিয়মে কোন ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। যেমন যে যার উপাসনালয়ে উপাসনা বা ইবাদত করবে, এখানে মুসলমান না হিন্দুদের বাধা দিতে পারবে ,না হিন্দু-মুসলমানকে বাধা দিতে পারবে।কখনোই বলা হচ্ছে না মুসলমানকে হিন্দুদের মন্দিরে পুজো করতে অথবা হিন্দুকে মুসলমানদের মসজিদে এসে নামাজ পড়তে। যতক্ষণ না তারা মুসলিম হন যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে মুসলমান হন তখনই সে নামাজ পড়বে এবং তা মুসলিম হিসেবে কবুল হবে। তবে দাওয়াতি চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে আমরা সব সময়ই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নির্দ্বিধায় সত্য অন্বেষণে মসজিদে আহবান করে থাকি। এতে কোন বাধা নেই কাছ থেকে আমাদের ধর্মকে উপলব্ধি করার। তবে মুসলমানের কোনরকমে

উচিত নয় মন্দিরে মূর্তিপূজার শামিল হওয়া কেননা তার শিরকের সমান। হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পূজায় অংশগ্রহণ করা যায়।তবে মসজিদে ঢুকলেই মুসলমানদের কাতারে শামিল হওয়ি যায় না।তাই এই বিবেচনায় মসজিদে প্রবেশে কোনো বাধা নেই।

অনূরুপ, অন্যায় যেই ব্যক্তির দ্বারা সমাজে সংঘটিত হবে, সে যে ধর্মের হোক না কেন তার দ্বারা সংঘটিত অন্যায়ের ওপর নির্ভর করে তার বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলাম শরীয়ত পন্থী দেশ ব্যবস্থায়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবশ্যই নির্ধারিত জিজিয়া ও অন্যান্য সুরিয়া নিয়ম অনুযায়ী থাকতে হবে, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

একটি সমাজে সহাবস্থানের জন্য আন্তঃধর্মীয় আলোচনার বিষয়বস্তু কখনোই সব ধর্মকে এক ধর্ম মানা নয়, বরং সকল ধর্মকে সম্মান করে প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রেখে একই সোসাইটিতে বসবাস করার পদ্ধতি এর বিষয়বস্তু। যদিও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আরো নানা সমস্যার সমাধান করা হয় তবে সব অবস্থায় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ব্যাপক।

সংলাপের চক্রান্ত

আধুনিকতার এই যুগে লাইব্রেরী বা সফটওয়্যার সাইটে ব্রাউজ করলেই সামনে আসবে বর্তমানে সংলাপের চিত্র।যা আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে।ইসলাম স্বয়ং সম্পূর্ণ , সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।এর মধ্যকার আর কোনো বিন্দু পরিমান সংশয় বা নিয়ম পরিবর্তন করার নেই।সেই থেকেই এর মধ্যে নতুনত্ব আনার প্রয়োজন ও নেই।তাই সংলাপের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে।কেননা ইহুদি-খ্রিষ্টান রা খুব সহজেই বিভিন্ন বক্রতাকে স্পষ্ট করে গ্রহন করে সহাবস্থানে সবোর্চ্চ বিনয় দেখাতে যা মুসলিম বা ইসলামের জন্য শোভনীয় নয়।ঠিক তার সুবিধা নিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিশাল দল সারা বিশ্বে শান্তির প্রতীক হিসেবে interfaith dialogue বা আন্তঃধর্মীয় আলোচনার প্রচারণা করছে।এবং সহাবস্থানের ভুল ব্যাখ্যা ও নিয়ম গড়ে তুলছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যাপক ব্যবহার মিশনারিদের মধ্যে দেখা যায়। মিশনারি হচ্ছে সেই সকল সংগঠন যারা অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে মুসলিমদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় তাদের কাজ চলমান, প্রাতিষ্ঠানিক ও ইসলামিক জ্ঞান কম থাকায় সে সকল মানুষদের খুব সহজেই তারা তাদের আয়ত্তে আনতে পারে।এর নানা রকমের পদ্ধতি রয়েছে যেমন আর্থিক সহায়তা দিয়ে তারা তাদেরকে এই পথে আনে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ খৃস্টান মিশনারী তৎপরতার অংশ। বাহ্যিকভাবে বলা হয় সংলাপের উদ্দেশ্য সব ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মগুলোর পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করা। প্রকৃত অর্থে এটি একটি বুলি। যদি তাই হতো তাহলে সব ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা হতো। সবাইকে নিজ নিজ ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস স্পষ্টভাবে বলার এবং অন্য ধর্মের ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরার সুযোগ দেয়া হতো। যাতে বিরোধের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়ে সমাধানের এবং হক গ্রহণের সুযোগ হয়। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। মুখলিস কতক মুসলিম বিদ্বান যারা না বুঝে বা ইসলামের দাওয়াতের লক্ষ্যে এসব সংলাপে যোগ দিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা হলো, ইসলাম ধর্মে কুঠারাঘাত, ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও সমালোচনা, খ্রিস্টবাদের জয়গান এবং খ্রিস্টবাদের অসাড় মতবাদ ও স্যাকুলারিজমের দিকে দাওয়াতই থাকে এসব সংলাপের মুখ্য বিষয়।মুসলিম প্রতিনিধিদেরকে ইসলামের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলে ভিন্ন ধর্মের সমালোচনার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরার কোনো সুযোগই দেয়া হয় না। তদ্রূপ ফিলিস্তিন, কাশ্মির, তুর্কিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো সমাধানের কথা তুলতেই দেয়া হয় না। আর উঠে গেলে ধামাচাপা দেয়া হয় যেকোনো পন্থায়। কারণ, সংলাপের চাবিকাঠি থাকে তাদেরই হাতে। তাদের অনুগ্রহের বাইরে মুসলিম প্রতিনিধিরা কিছুই বলতে পারে না।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য বিভিন্ন ধরণের সংগঠন কাজ করে, যেমন বিশ্ব ধর্ম সংসদ (Parliament of the World's Religions), বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়াতে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা তৈরি করতে এবং শান্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কাজ করে।
প্রধান সংগঠনসমূহ,

বিশ্ব ধর্ম সংসদ (Parliament of the World's Religions): এটি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সহযোগিতার জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করে।

বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন: অনেক ধর্মীয় সংগঠন, যেমন রোমান ক্যাথলিক চার্চ, বিশ্বের অন্যান্য চার্চ এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় সংগঠনগুলো (যেমন, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ চার্চেস) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্পর্ক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান: অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষায়তনিক সংগঠন, যেমন EBSCO এবং ResearchGate, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উপর গবেষণা করে এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরে।

অন্যান্য সংগঠন: এছাড়াও, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনও আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে উৎসাহিত করে এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে, যেমন Institute for Cultural Diplomacy।

তাদের কার্যক্রম সংলাপ ও আলোচনা: তারা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা, বৈঠক এবং সম্মেলনের আয়োজন করে।

শিক্ষা ও সচেতনতা: ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা: অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখে।

যদিও সকল ক্ষেত্রেই এদের ধর্মীয় সহনশীলতা কে প্রাধান্য দেয়া বা তা দেখানো হয়। তবে বিভিন্ন দলের সংগঠন সুদূরপ্রসারী কাজ করে যাচ্ছে। যা ভবিষ্যতের জন্য ভয়ঙ্কর, ধর্মীয় সভ্যতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ওয়াহদাতুল আদিয়ানা এর ন্যায় বিকৃতি করন , নতুন ধর্মে একত্রিত করন, ধর্ম থেকে দূরে সরানো।

সংলাপের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সংগঠন মনে করে।ধর্মের পূর্বশর্ত অনুযায়ী কোনো কোনো ধর্মই নিজেকে নির্ভুল, সবচেয়ে সম্মান জনক ভাবতে পারবে না। সবাই সবার কাছ থেকে শিখবে।সমান ভাববে, যা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।কারন ইসলাম স্বয়ং সম্পূর্ণ ধর্ম,আর এটি একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।”[২৩]

এদিকে থেকে কোনো আপোষ ইসলাম করতে পারে না।আর এরই সুযোগে ইসলামে গোঁড়ামির ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি Interfaith dialogue নিয়ে কাজ করতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দেখা যায় । ইন্টারফেইথ ডায়লগের মাধ্যমে ধর্মীয় ছাড়, কঠোরতা বিহীন জীবন ব্যবস্থা তুলে ধরে।অনেক সময় এতে অংশগ্রহণকারী মুসলিম তার মিলাতে গিয়ে ইসলামি শরিয়া বহির্ভূত আইনের পক্ষে সায় দিয়ে বসে। যা ধীরে ধীরে একসময় হালকা নিয়মে পরিবর্তিত হয়।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সূত্রপাত অনেকটা এমন ভাবে উঠে এসেছে যে দীর্ঘ দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইসলামের বিদ্বেষীরা বুঝতে পেরেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে স্রেফ সামরিক যুদ্ধে,তথা জিহাদ মুসলিমদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ, তারা এমন এক সুদৃঢ় ইসলামী আকিদা নিয়ে যুদ্ধ করে, যে আকিদায় বিশ্বাসীরা পিছু হটার নয়।আকিদা ইং আমাদের শক্তি নয়,বরং আকিদা আমাদের আসমানী শক্তির জোগান দেয়।কেননা আমাদের ফয়সালা কারী স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

তাই তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করে ভিন্ন একটি পথ বেছে নিল। তারা চাইল, ইসলামী আকিদাকে বিনষ্ট করে দিতে। ঈমান ও কুফরের সীমারেখা উঠিয়ে দিতে। আল-ওয়ালা ওয়াল-

বারার আকিদা বিস্মৃত করে দিতে। আল-ওয়ালা ওয়াল বারার হচ্ছে মুমিনদের ভালোবাসা ও নুসরত করা আর কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা ঈমানী দায়িত্ব তা বোঝায়।
ধর্মীয় দিক থেকে সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভিন্নতা মুসলিমদের থেকে উঠিয়ে মুমিন - কাফের সমান–সমাজ গড়ে তুলতে।যেহেতু কাফেরের সাথে দুশমনির মনোভাব থাকবে না তাই এমন সমাজ কখনোই দখলদার কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। বরং ভালোবেসে বুকে টেনে নেবে। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের উদারপন্থী মনোভাবীদের খুব সহজেই খ্রিষ্টান বানানো যাবে। এটিও তাদের একটি বড় উদ্দেশ্য।এটি বাস্তবায়নের উত্তম পন্থা 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপের'। সব ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে মুসলিম নামধারী কিছু মোল্লাও সেখানে থাকবে। আলোচনা পর্যালোচনায় তারা একমত হবে যে, ধর্মে ধর্মে কোনো বিভেদ-বিদ্বেষ নেই। এক ধর্ম অন্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার সমর্থন করে না।অথচ সর্বোত্তম সবসময় সাধারণের চেয়ে উপরে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।
ধর্ম শুধু ভালবাসতে শেখায়, তাই ধর্মের কারণে যুদ্ধ করা সমর্থন করে না। সব ধর্মের একই কথা সবার উপর মানবতা। যারা ধর্মের ভিত্তিতে ব্যবধান করতে চায়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা উগ্রবাদী–জঙ্গি–সন্ত্রাসী। তারা শান্তি-সম্প্রীতির জন্য হুমকি। তাদের নির্মূল অত্যাবশ্যক।

মুখে মুখে সব ধর্মের কথা বলা হলেও মূল টার্গেট ইসলাম। মুসলিমদের মাঝে এ ধারণার প্রসার করা যে, ইসলাম অন্য ধর্মকে হেয় করে দেখে না। অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ শেখায় না। ইসলাম শুধু ভালোবাসা শেখায়। দখলদার কাফের হলেও, দ্বীন-ধর্ম ও মুসলিম ভূমি, সম্পদ ও সম্ভ্রম লুণ্ঠনকারী হলেও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যাবে না।বরং সমঝোতায় যেতে হবে যেমনটা বর্তমানে হচ্ছে।

সব ধর্মই যদি ভালোবাসার কথা বলে তাহলে মুসলিমরা বৌদ্ধদের হাতে আরাকান-উইঘুরে কেন নিষ্পেষিত? হিন্দ-কাশ্মিরে হিন্দুদের হাতে কেন নির্যাতিত? ফিলিস্তিন-শাম-ইরাক-আফগানসহ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে কেন ইয়াহুদ-নাসারা-শিয়াদের হাতে নিপীড়িত? কোথায় গেল মানবতা–সম্প্রীতি-ভালোবাসা–সহমর্মিতা? আসলে সম্প্রীতির নামে ঔপনিবেশ কায়েমের এ এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।

বাস্তবিক আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদাহরণ

২০১৯ এ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি প্রতিবেদন—

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : উগ্রবাদী চিন্তা থেকে অন্য ধর্মের ওপর আক্রমণ
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট

চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রামে এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বলেছেন, প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রীতির কথা বলে, কিন্তু কিছু মানুষ ধর্মের মূল সুর কি সেটাই বোঝে না। ভুল চিন্তা থেকে তারা ভাবে, তার নিজের ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই চিন্তা একটি উগ্রবাদী চিন্তা। এই উগ্রবাদী চিন্তা থেকেই তারা অন্য ধর্মের লোকের ওপর আক্রমণ করে। দেশে বিভিন্ন সময় দুর্বল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর যেসব আক্রমণ হয়, তা এই উগ্রবাদী চিন্তার ফল।

শনিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর পাথরঘাটায় আর্চবিশপ ভবন সভাকক্ষে এই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক বিশেষ আলোচনা সভা হয়েছে। খ্রিস্টিয় ঐক্যপ্রচেষ্টা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস এই সভার আয়োজন করে। সভায় খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকরা অংশ নেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খ্রিস্টিয় ঐক্যপ্রচেষ্টা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের কো-অর্ডিনেটর জেমস গোমেজ।

চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের জুডিশিয়াল ভিকার ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরু বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি আছে সেটা বিশ্বে অনুসরণযোগ্য। কিন্তু এরপরও কিছু ঘটনা এখানে ঘটে। এটা মূলত ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব যার ফলে সম্প্রীতিতে ফাটল এবং অজ্ঞানতা থেকে হয়। খ্রিস্টান ধর্ম বলছে, কাউকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ কোনো মানুষকে বাদ রেখে সম্প্রীতি হতে পারে না, সেটা যে ধর্মের বা যে জাতিগোষ্ঠীর হবে হোক। সম্প্রীতি তৈরি করতে হবে মানুষে-মানুষে, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মে নয়।’চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবুল হোসেইন বলেন, ‘উগ্রবাদী চিন্তা থেকে এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোককে আক্রমণ করে। ভোলায় সাম্প্রতিক যে ঘটনা ঘটেছে, একই ঘটনা কিন্তু আগেও আমাদের দেশে ঘটেছে। এর সবই উগ্রবাদী চিন্তার ফল। ধর্ম যে শুধু চর্চার বিষয় নয়, এটি যে পড়াশোনা করে ধারণের বিষয় সেটা আমরা অনেকসময় মাথায় রাখি না। আবার আমি এক ধর্মের অনুসারী বলে যে আরেকটি ধর্ম সম্পর্কে আমার পড়াশোনার প্রয়োজন নেই,

সেটিও সঠিক নয়। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ পড়তে হবে। প্রত্যেক ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মে কি লেখা আছে সেটা যদি আমি জানি, তাহলে আমার মধ্যে ওই ধর্ম সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ থাকবে না। সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে এই বিশ্বকে শান্তিময় করে তুলতে হবে, এটাই হোক প্রত্যেক ধর্মের মূল সুর।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, 'আমাদের সমাজে ক্ষমতা পেলে অন্যকে মানুষ বলে গণ্য না করার একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অথচ ধর্ম বলছে, যত বেশি উপরে উঠবে তত বেশি বিনয়ী হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে হচ্ছে উল্টোটা। ক্ষমতার জোরে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুকে মানুষ বলে মনে করে না। আমি যদি ভাবি যে, আমার মতবাদ বা আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, বাকি ধর্মগুলো কিছুই না, তখন অন্য ধর্মগুলো গৌণ হয়ে পড়ে। এতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথচ মানুষকে ভালো না বাসলে প্রভুকে ভালোবাসা যায় না। এটাই বৌদ্ধ ধর্মের মূলরীতি।'

অধ্যাপক স্বদেশ চক্রবর্তী বলেন, 'ভোলায় সাম্প্রতিক যে ঘটনা ঘটেছে, গত কয়েক বছরে আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেটা দেখেছি। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে মুচি, কে শিক্ষক এই ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে যদি আমরা উঠতে না পারি তাহলে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে না। হিন্দু-মুসলিম, মুচি-শিক্ষক সবাই মানুষ। মানুষকে বাদ দিয়ে, মানুষকে দূরে সরিয়ে কোনো সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা হবে না সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তখন শুধু সনাতন ধর্মের জন্য করে না। সমগ্র মানবজাতির জন্য করে। সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই- এর চেয়ে বড় সম্প্রীতির জয়গান আর হতে পারে না।'সভাপতির বক্তব্যে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা বলেন, 'সংলাপ হচ্ছে একে অপরের কাছে আসার, একে অপরের অন্তরে ধারণের একটা পদ্ধতি। সংলাপের মাধ্যমে সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে ওঠে। এই সংলাপ অব্যাহত থাকবে। ১০ জন নিয়েও সংলাপ করা যায়, ১০০-৫০০ জন নিয়েও করা যায়। মূল সুরটা থাকবে শুধু সম্প্রীতি। ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে, মানুষে-মানুষে সম্প্রীতিই হচ্ছে এর মূল সুর।'

জেমস গোমেজ বলেন, 'সারাবিশ্বে আজ যে ধরনের সংঘাত, রক্তপাত, হানাহানি চলছে, মানুষে-মানুষে বিভেদ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে সম্প্রীতি। সব ধর্মের মানুষকে সম্প্রীতির মন্ত্রে এক করাই হচ্ছে এর সমাধান। মানুষ হিসেবে নিজেকে বড় মনে না করে আমরা যদি বিনয়ী হই, নত হই তাহলে সংঘাত অনেকাংশে কমে যাবে।

সংলাপের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিকতাবোধ জাগানোর একটা প্রয়াস আমরা শুরু করেছি মাত্র।'

'সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আমাদের নেতৃত্ব' শীর্ষক এই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সঞ্চালনা করেন সেন্ট স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষিকা মার্গারেট ইউগিনি। এতে বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীতও পরিবেশন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকেরাও।[২৪]

উপরি উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে মৌলিক যেসকল মৌলিক বিষয়বস্তু দেখা যায়।

১. নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্য ধর্মকে খাটো করে দেখা যাবে না। এটি একটি উগ্রবাদী চিন্তা।

২. কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না।

৩. ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বিভাজন হবে না। ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে ভালোবাসা যাবে না, ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে ঘৃণা করা বা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। বন্ধুত্বের মাপকাঠি ধর্ম নয়। 'সম্প্রীতি তৈরি করতে হবে মানুষে-মানুষে, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মে নয়।'

৪. পড়াশুনা নিজ ধর্মে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ পড়তে হবে। প্রত্যেক ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ধর্মে কী লেখা আছে জানতে হবে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ নিয়ে যতগুলো প্রতিবেদন আপনি পড়বেন সবগুলোর মূলকথা মোটামুটি কাছাকাছি।[২৫]

গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং রোজ শনিবার ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন 'চেতনায় সম্প্রীতি'তে 'উগ্রবাদ: ধর্ম যখন হাতিয়ার' শীর্ষক আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন হয়। মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে তাতে যোগ দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মানজুরে ইলাহী।
এ সংলাপেরও মৌলিক বিষয়বস্তু বাকী সংলাপের ন্যায় একই।
এছাড়াও ভারতের মাহমুদ মাদানি, বাংলাদেশের ফরিদ উদ্দীন মাসউদসহ আরও যারা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রচারক কিংবা মুভ ফাউন্ডেশনের কর্মী বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের সকলের বক্তব্যে মোটামুটি এ ধরনের কথাই থাকে।

ইসলামে সাংঘর্ষিক সংলাপ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মৌলিক বিষয়বস্তুর প্রায় সবগুলোই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এর প্রধান ও প্রথম বিষয়বস্তু নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মানা যাবে না। **ইসলাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ** এবং **একমাত্র মনোনীত দ্বীন**। এটি **স্বয়ংসম্পূর্ণ।**
এ বিষয়ে কোরআনে বলা হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[২৬]

আল্লাহ তাআলা ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম কে নিষিদ্ধ করেছেন।যদিও প্রত্যেক নবী ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন,তারপরও তারা বিকৃত।তাই তিনি প্রত্যেককে ইসলামের তালাশ করতে বলেছেন। কুরআনে বলেছেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।"[২৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুসরণ করা অবস্থায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে, তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম সম্পর্কেও সচেতন করেছেন।

"ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মতের ইহুদি নাসারা যেকোনো লোক আমার (আগমনের) কথা শুনবে তারপর আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তাতে ঈমান না এনেই মারা যাবে নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামি হবে।"[২৮]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহু বলেছেন,

“ইহুদি নাসারার কথা বিশেষভাবে বলেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য যে, অন্যদের বেলায় তা এর আগেই প্রযোজ্য। কারণ, ইহুদি নাসারার আসমানি কিতাব রয়েছে। কিতাব থাকার পরও যখন তাদের এ হাল, তখন অন্য যাদের কিতাব নেই তারা তো এর আগেই জাহান্নামি।”

–নববি রহিমাহুল্লাহ কৃত শরহে মুসলিম : ২/১৮৮।

আসলে কিতাবগণ ধর্মগ্রন্থ কে বিকৃত করে ফেলেছেন। এই কারণে নানা সকল ধর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যদিও তা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পক্ষ থেকে এসেছে।আসলে কিতাবগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্ম গ্রন্থে সংযোজন বিয়োজন করেছেন যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

“অতএব, ধ্বংস ওদের কপালে যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, অতঃপর বলে, ‘এ (কিতাব) আল্লাহর পক্ষ থেকে (নাযিলকৃত)’- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য লাভ করতে পারে। অতএব, ওদের কপালে ধ্বংস- স্বীয় হাতের এ লেখার কারণে এবং ধ্বংস নিজেদের এ উপার্জনের কারণে।”[২৯]

ইহুদি-নাসারারা শুধুমাত্র অর্থ সংযোজন বিয়োজন নয়, বরং উচ্চারণ ও বিকৃত করে পাঠ করে। যার ফলে অন্যান্যদের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। এছাড়াও তারা সে সকল মিথ্যা বাণীকে আল্লাহতালার বানী বলে চালিয়ে দেয়।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

“নিঃসন্দেহে তাদের একটা দল এমন রয়েছে যারা নিজেদের জিহ্বা মোচড়িয়ে কিতাব পড়ে, যাতে তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। ওরা বলে, ‘এ আল্লাহর নিকট থেকে (নাযিলকৃত)’- অথচ তা আল্লাহর নিকট থেকে (নাযিলকৃত) নয়। আর এরা জেনেশুনে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে।”[৩০]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন।আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে বলে গিয়েছেন। তবুও বর্তমানে কিছু কিছু মৌলভী আলেমদের মধ্যে এর প্রবণতা দেখা যায়। যারা পাঠ করে কোরআন থেকে কিন্তু বর্ণনা করেন নিজেদের চিন্তাধারা থেকে।

ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম ও মতবাদের অনুসারীরা কাফের, এই চিন্তা ধারা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে। আমার সাথে সাংঘর্ষিক।
কেননা পূর্ববর্তী সকল ধর্মকেই আল্লাহ সুবহানাতায়ালা নিষিদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। যেহেতু তারা করতে গিয়ে তাদের ধর্মকে এবং ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করেছেন। তাই সে সকল ধর্ম ও মতবাদ অনুসরণ করা এবং তা অনুসরণ করলে নাজাত ও জান্নাত পাওয়ার বিশ্বাস করলে বা তাদের বিশ্বাসে সমর্থন করলে তা ইসলামে আকিদার বিপক্ষে যায়। তারা নিশ্চিত ভাবে কাফের স্থায়ী জাহান্নামী। এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বিষয়ই হতে পারে না, কেননা এই আলোচনা প্রধানত সহাবস্থান ও ধর্মীয় দাওয়াতের ক্ষেত্রেই ইসলামে প্রযোজ্য।তাই সহাবস্থানের কে আইন মানছে আর কে মানছে না তাই প্রধান,কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী ও রীতি ধারায় বিশ্বাসী তার উপর নয়। কারন যার যার ধর্ম,তার তার নিয়ম। আর দাওয়ার কাজে বিধি নিষেধ ই জানানো দাঈ' দের কাজ।
ইমাম ইবনে হাজম রহিমাহুল্লাহ বলেন,"মুসলমানদের মাঝে কোনও দ্বিমত নেই যে, এটি (ইঞ্জিল) রহিত হয়ে গেছে এবং যে ব্যক্তি ইঞ্জিলের বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করবে, যে বিধানের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে সুস্পষ্ট ওহী অবতীর্ণ হয়নি, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুশরিক।"[৩১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,"ইসলাম ধর্মে সর্বজনবিদিত এবং সকল মুসলমানের ঐক্যমতে সাব্যস্ত যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কিংবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়ত ব্যতীত ভিন্ন কোনো শরীয়ত অনুসরণের বৈধতা দেবে সে কাফের।"[৩২]

বরং এই বিষয়ে সোচ্চার এবং স্পষ্ট মনোভাব পোষণ করতে হবে। নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা যাবে না। কাফেরকে কাফের এবং মুমিন ব্যক্তিকে মুমিন ব্যক্তি বলেই ঘোষণা করতে হবে। এ বিষয়ে কাজী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের কাফের না বলবে বা কাফের-মুমিন কোনোটাই না বলে নিরপেক্ষ থাকবে অথবা তারা কাফের হওয়ার

ব্যাপারে সন্দেহ করবে কিংবা তাদের ধর্মকে সহীহ বলবে- এমন ব্যক্তি কাফের, যদিও সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে।"[৩৩]

সকল বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, তাই যারা মানব ধর্ম বলে ধর্ম ধর্মে বিভেদ উঠিয়ে দিতে চায়। সব ধর্মকে সমান বলে স্বীকৃতি দিতে চায় তারাই মূলত কাফের।

কাফেররা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু।মুখে যতই সম্প্রীতির কথা বলুক না কেন ,না তারা কখনো আমাদের মেনে নিতে পারবে না আমরা তাদের পারবো যতক্ষণ না ইসলামের ছায়াতলে আসছে।এই বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ .

هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতামূলক বিদ্বেষ তো তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। আমি আসল কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ্য হও।

দেখো! তোমরা তো এমন যে তোমরা তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা মোটেও তোমাদের ভালোবাসে না। তোমরা তো সমস্ত (আসমানি) কিতাবেই বিশ্বাস করো। অথচ (তাদের অবস্থা হলো) তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' আর যখন যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। আর আল্লাহ্ মনের কথা ভালই জানেন।

তোমাদের যদি কোনো কল্যাণ হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অকল্যাণ হয় তাহলে আনন্দিত হয়। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন

কর, তাহলে তাদের চক্রান্তে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্ত আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।"[৩৪]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2)

হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তারা তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে কেবল এই অপরাধে (মক্কা থেকে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর, তা আমি খুব ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমনটা করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল।
তাদের চরিত্র হচ্ছে কোনরূপে তোমাদেরকে বাগে পেয়ে গেলে তারা তোমাদের মারাত্মক শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ দেশে তোমাদের প্রতি বাহু ও রচনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে কোন রূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও।"[৩৫]

মক্কার কাফেরগণ এবং নবী (সাঃ)-এর মাঝে হুদাইবিয়াতে যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল, মক্কার কাফেররা তা ভঙ্গ করল। এই জন্য নবী (সাঃ)ও গোপনে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। হাত্বেব ইবনে আবী বালতাআ' (রাঃ) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। কুরাইশদের সাথে তাঁর কোন আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি মক্কাতেই ছিল। তিনি ভাবলেন যে, মক্কার কুরাইশদেরকে যদি নবী (সাঃ)-এর প্রস্তুতি সম্পর্কে জানিয়ে দিই, তাহলে এই অনুগ্রহের বদলায় তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযত করবে। তাই তিনি এই সংবাদটা লিখিত আকারে এক মহিলার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের নিকট প্রেরণ করলেন। এদিকে অহীর মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-কে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই তিনি আলী, মিকদাদ এবং যুবায়ের (রাঃ)-দেরকে বললেন, "যাও, 'রওযাত্বু খাখ' নামক স্থানে মক্কাগামিনী একজন মহিলাকে পাবে; তার কাছে

আছে একটি পত্র, সেটি উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।" তাঁরা গিয়ে তাঁর কাছ থেকে পত্র উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, যা সে তার মাথার চুলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। তিনি হাত্বেব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, "তুমি এ কাজ কেন করেছ?" তিনি বললেন, 'আমি এ কাজ কুফরী এবং দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়ার কারণে করিনি, বরং অন্যান্য মুহাজির সাহাবীদের আত্মীয়-স্বজন মক্কাতে বিদ্যমান থাকায় তারা এঁদের (মুহাজির সাহাবীদের) সন্তান-সন্ততির হিফাযত করে। আমার সেখানে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। তাই আমি চিন্তা করলাম যে, আমি যদি তাদের কিছু জানিয়ে দিই, তবে তারা আমার অনুগ্রহের মূল্য দিয়ে আমার সন্তানদের হিফাযত করবে।' রসূল (সাঃ) এ কথা সত্য জেনে তাঁকে কিছুই বললেন না। তবুও আল্লাহ সতর্কতা স্বরূপ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। যাতে আগামীতে কোন মু'মিন কোন কাফেরের সাথে যেন এই ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে। (বুখারী সূরা মুমতাহিনার তাফসীর, মুসলিম ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়) [২] অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-এর এই প্রস্তুতির খবর তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করতে চাও? [৩] যখন তাদের তোমাদের সাথে এবং সত্যের সাথে এই ধরনের আচরণ, তখন তোমাদের জন্য কি এটা উচিত যে, তোমরা তাদের সাথে ভালবাসা রাখবে ও সহানুভূতি দেখাবে? [৪] বন্ধনীর মাঝে এটা শর্তের জওয়াব; যা আয়াতে উহ্য আছে। [৫] অর্থাৎ, আমার এবং তোমাদের শত্রুদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক জুড়া এবং তাদের কাছে গোপনে পত্র ও বার্তা প্রেরণ করা হল ভ্রষ্টতার পথ, যা অবলম্বন করা কোন মুসলিমের উচিত নয়।[৩৬]

তাই মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের পূর্বে এই সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। পুরো কোরআনে তিনি বিভিন্ন জায়গায় সম্পর্কে বারবার একই সতর্কতা দিয়েছেন।

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে; যদি তারা তা করতে সক্ষম হয়।"[৩৭]

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"ইয়াহুদ-নাসারা কিছুতেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি (তোমার ধর্ম ছেড়ে) তাদের ধর্ম অনুসরণ কর।"[৩৮]

এই বিষয়ে উত্তম আদর্শ হিসেবে আমাদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী থেকে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ- যাবৎ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।"[৩৯]

কাফের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের বারবার সতর্ক করেছেন এবং সেই সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তাই কোন ভাবে কোন ক্ষেত্রে আমাদের কাফেরদের সঙ্গে সাম্যতা সম্ভব নয়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট।"[৪০]

অন্যদিকে বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ(7)

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।"[৪১]

অর্থাৎ তারা কোনারূপ এই সমান হতে পারে না, এতে মুমিন ব্যক্তির শানে আঘাত আসে। সৃষ্টির সেরা জীব–আশরাফুল মাখলুকাত–হচ্ছে মানুষ আর তাদের মধ্যে **সর্বোত্তম হচ্ছে মুমিন ব্যক্তি**। অন্যদিকে, **কাফেরদের সর্ব নিকৃষ্ট জন্তু** হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা–মুমিনকে ভালোবাসা ও নুসরত করা এবং কাফেরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ– করা থেকেও দূরে থাকার তাগিদে দেয়া হয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপে।আমরা জেনেছি, কাফেররা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের শত্রু,এরা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব। অন্যদিকে ,মুমিনরা সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আল্লাহর এই প্রিয়পাত্রদের ভালোবাসা ও নুসরত করা আর আল্লাহর দুশমনদের সাথে দুশমনি পোষণ করা ঈমানের দাবি। এই আকিদারই নাম ওয়ালা বারা। মুমিন দুনিয়ার যে প্রান্তেরই হোক, যে বর্ণেরই হোক সে আমার ভাই, আমার বন্ধু। তাকে নুসরত করা, তার পাশে দাঁড়ানো আমার দায়িত্ব। পক্ষান্তরে কাফের আমার মায়ের সন্তান হলেও সে আমার দুশমন। তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা অপরিহার্য। একেই বলে 'আলহুব্বু ফিল্লাহ ওয়ালবুগদু ফিল্লাহ' তথা 'আল্লাহরই জন্য ভালোবাসা, আল্লাহরই জন্য দুশমনি'। আল্লাহ তায়ালা এবিষয়ে বলেন,

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে নিজেদের মিত্র (কিংবা অভিভাবক) না বানায়। যে এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনো পন্থা অবলম্বন কর, সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তার নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন। (কারণ, একদিন) তারই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।"[৪২]

মুমিনগণের ঐক্যবদ্ধ সম্পর্কে নবী করীম সাঃ বারবার তাগিদ দিয়ে গেছেন। এবং এর গুরুত্ব বোঝাতে বর্ণনা করে গেছেন একাধিকবার।

"হযরত আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে'। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক হাতের আঙ্গুলগুলো আরেক হাতের আঙ্গুলগুলোতে প্রবেশ করালেন।"[৪৩]

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও শরীয়াহ এর পক্ষ থেকে কয়েকটি মূলনীতি থেকে সংলাপে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে।

- আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম,এরই সাথে পূর্বেকার সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির একমাত্র পথ দ্বীন ইসলাম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদের অনুসারী বা বিশ্বাসী হবে কিংবা সেগুলোকে সহীহ ও মুক্তির পথ মনে করবে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি।
- কাফেররা নিকৃষ্ট। আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের দুশমন। পক্ষান্তরে মুমিন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র।
- মুমিন পরস্পরের ভাই ও বন্ধু। মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব এবং কাফেরের সাথে দুশমনি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু এই সবগুলোই বর্তমানের সংলাপের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন।যা তাদের সাথে সাংঘর্ষিক। উপরে উল্লেখিত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়,

- প্রত্যেক ধর্মকে সমান চোখে দেখা। নিজ ধর্মকে উত্তম ভাবা যাবে না। যা উগ্রবাদী চিন্তা।
- প্রত্যেক ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীলতা পোষণ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না।
- ধর্মের উপর ভিত্তি করে কাউকে ভালোবাসা বা ঘৃণা করা যাবে না। বন্ধুত্ব বা সুসম্পর্ক ধর্মের উপর নির্ভর করবে না।
- নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

এর বেশিরভাগই সরাসরি ইসলাম পরিপন্থী।
তবে হ্যাঁ, অন্তর্নিহিত অর্থের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

- প্রত্যেক ধর্মকে ইসলাম সমান দৃষ্টিতে দেখতে নিষেধ করলেও কোনো ধর্মকে অপমান করতে নিষেধ করেছেন।কেননা অজ্ঞতাবশত তারাও আমাদের ধর্মকে অপমান করবে।এছাড়াও কোনো কারন ছাড়া অন্য ধর্মে আঘাত আনে এমন সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুৎসাহিত করেছেন।
- কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মানেই তাদের সাথে অহেতুক ঝগড়া-বিদ্বেষ করার কথা ইসলাম বলে না।বরং অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।এবং ইসলামের ক্ষতি হয় এমন কর্মকান্ডে বাধা দেয়ার কথা বলেছেন।
- অতীতের ঘটনা ও মহান আল্লাহর সতর্কবাণী থেকেই কাফেরদের সাথে নির্দিষ্ট দূরত্ব–সেটা বন্ধুত্ব হোক বা প্রয়োজনের–বজায় রাখতে বলেছেন।তবে মুসলিম ব্যক্তিদের

আমাদের কাছে হকের অধিকার বেশি।একে মানুষ হিসেবে অন্যদিকে একই উম্মাহ হিসেবে,তারপর শুধু মানুষ হিসেবে তাদের–বেধর্মীদের– অধিকার।

যুগে যুগে নবী-রাসুলগন আল্লাহর তরফ থেকে যে সত্য-সঠিক ধর্ম নিয়ে এসেছেন আমরা তার সবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। তবে ইসলাম আসার সাথে সাথে আগেকার সকল শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। অধিকন্তু ইয়াহুদ নাসারা তাদের ধর্ম বিকৃত করে ফেলেছে। যদি অবিকৃতও থাকতো তবুও তা অনুসরণ করা যেতো না। যারা ইসলাম ছেড়ে আগেকার ধর্মের অনুসরণ করতো নিঃসন্দেহে তারা কাফের বলে পরিগণিত হতো। কাজেই "কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না" শিরোনামে অন্য ধর্মগুলোকে হক বিশ্বাস করার বা অনুসরণ বৈধতার যে দাওয়াত তারা দিচ্ছে তা সুস্পষ্ট কুফর। সম্পূর্ণ অন্ধকারের পথে বিশ্বাসী ও অনুসারী ও আলোর পথের পথিকদের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ।ঠিক তেমনি মুসলমান ও বেধর্মীদের।মানব জাতির বিভাজন হবে ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে। একদল ঈমানদার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয়পাত্র, সৃষ্টির সেরা এবং চিরস্থায়ী জান্নাতি। আরেকদল কাফের, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দুশমন, সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি। কাজেই যারা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন উঠিয়ে দিতে চায়, ঈমান ও কুফরের সীমারেখা মিটিয়ে চায়, সম্প্রীতির নাম করে ঈমান ও কুফরকে এক করে ফেলতে চায় তারা নিঃসন্দেহে কাফের।একজন মুসলমানের কখনই অন্যধর্মের জ্ঞান রাখার প্রয়োজন নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ,কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তি এ বিষয়ে জানতে পারে যা শর্তসাপেক্ষ। যেমন কোনো দাঈ,যে সংযত বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে থাকে,সেই প্রয়োজনে অন্য ধর্মগ্রন্থ বা নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারেন।এসকল ধর্মের ভিতর গত ভুল,বিকৃত নিয়ম ও অযৌক্তিক চিন্তাধারাকে সবার সামনে তুলে ধরতে।তবে সাধারন মুসলমানের জন্য নিজের ধর্ম তথা ইসলামকে সঠিকভাবে জানা জরুরী,কেননা নিজ ধর্ম সম্পর্কে সম্পুর্ন জ্ঞান না থাকলে তার মাহাত্ম্য প্রকাশে করায় পিছিয়ে পড়তে হবে।

সাধারণ মুসলিমদের জন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার অন্যতম কারণ দুর্বল ঈমান। তাই সে বিষয়ে সাবধান থাকার তাগিদে দেয়া হয়েছে। অন্য ধর্ম সম্পর্কে কাফের হয়ে যায় না ঠিকই কিন্তু কাফের হওয়ার পথ সুগম হয়।

"জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন আহলে কিতাবের কারো থেকে পাওয়া একটা কিতাব নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতাবটি পড়ে শুনাতে লাগলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, দ্বীনের ব্যাপারে কি তোমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য

দিশাহীনতায় নিপতিত হয়েছো হে খাত্তাবের বেটা? ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কাছে আমি শুভ্র সাদা, স্বচ্ছ পরিষ্কার দ্বীন নিয়ে এসেছি। আহলে কিতাবের কাছে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। হতে পারে তারা সত্য বললে তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে কিংবা মিথ্যা বললেও বিশ্বাস করে বসবে। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, স্বয়ং মূসা আলাইহিস সালামও যদি জীবিত থাকতেন, আমার অনুসরণ ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর থাকতো না।”[৪৪]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মতো সাহাবি, যাকে দেখলে শয়তান পালিয়ে যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পর্যন্ত ভিন্ন ধর্ম অধ্যয়নের অনুমতি দেননি, নাখোশ হয়েছেন। সেখানে সাধারণ মুসলিমদের ভিন্ন ধর্ম অধ্যয়নের দাওয়াত কুফরির পথে আহ্বান ছাড়া আর কি হতে পারে?

তাই পূর্বে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে,যে সুগভীর ইসলামি জ্ঞানসম্পন্ন, পাহাড়সম সুদৃঢ় আকিদার অধিকারী, মুত্তাকি পরহেযগার ইসলামী শায়েখগন যদি খণ্ডনের প্রয়োজনে ভিন্ন ধর্ম অধ্যয়ন করেন তাহলে তাদের বিষয়টা ভিন্ন। তারা বাতিলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবেন না। সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ওলামা-তলাবার জন্য নাজায়েয।

আর্চবিশপ মজেস সংলাপের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছে: ‘সংলাপ হচ্ছে একে অপরের কাছে আসার, একে অপরের অন্তরে ধারণের একটা পদ্ধতি’। ‘সব ধর্মের মানুষকে সম্প্রীতির মন্ত্রে এক করা’।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পূর্বের উল্লেখিত বিভিন্ন কারণ এর মধ্যে দেখানো হয়েছে জিহাদ নিশ্চিহ্ন করা, মুসলিমদের ধর্মান্তরিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি। জিহাদকে নিশ্চিহ্ন করার বিভিন্ন শর্ত আদর্শ ধর্মীয় সংলাপে রয়েছে আর এর প্রমাণ ও বাস্তব জীবনে দেখা যায় যারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বিশ্বাসী, তাদের বেশিরভাগ ব্যক্তিবর্গই জিহাদকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে। যেমন:

ক. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ

বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির একজন বিশিষ্ট প্রচারক ফরিদ উদ্দীন মাসউদ। তার জিহাদ বিরোধীতার কথা সকলে অবগত। এক লাখ আলেমের জাল স্বাক্ষরিত শান্তির ফতোয়া নামে সে জিহাদ বিরোধী একটি ভূয়া ফতোয়া প্রকাশ করেছে, যা সকলের জানা আছে।

খ. ড. মানজুরে ইলাহী

ইদানিং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি সমর্থকদের মাঝে নতুন মুখ উঠে এসেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মানজুরে ইলাহী। কিছুদিন আগে ডিবিসি নিউজ কতৃক আয়োজিত একটি সংলাপে তিনি যোগ দেন- যেমনটা পূর্বে বলেছি এবং ভিডিওর লিংকও দিয়েছি। এছাড়া ২০১৮ সালে জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে বৈচিত্র্য এবং আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ক প্রোগ্রামের আওতায় তিনি জার্মানীতেও গিয়েছিলেন।এক অনুষ্ঠানে তিনি জিহাদের জন্য রাষ্ট্রশক্তি থাকা শর্ত করেছেন। অন্যথায় জিহাদ নাজায়েয বলেছেন। এভাবে তিনি মূলত উম্মাহর এ দুর্বলতার সময়ে জিহাদের রাস্তাটা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছেন, যেটা তার মতো অনেকেই এ বুলির আড়ালে করে থাকে। আলকায়েদার জিহাদকে ইসলাম সমর্থন করে না বলেছেন। রাশিয়া পরবর্তী তালেবানের জিহাদকেও তিনি ইসলামি জিহাদ নয় বলেছেন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যর্থতা বেশি, ড. মুহাম্মাদ উমারা, যিনি বহু সংখ্যক সংলাপে যোগ দিয়েছেন এবং অবশেষে নিরাশ হয়ে এ পথ পরিত্যাগ করেছেন।তার অভিজ্ঞতার কথা,তিনি مأزق المسيحية والعلمانية في أوربا গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃষ্ঠা: ৫-১২) উল্লেখ করেছেন।

“আন্তঃধর্মীয় সংলাপ – বিশেষত যেগুলো পশ্চিমা খ্রিস্টীয় প্রতিনিধিদের সাথে হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপার আমার অভিজ্ঞতা নেতিবাচক। এসব সংলাপের জন্য অসংখ্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। অংসখ্য কনফারেন্স, বৈঠক ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশাল অংকের অর্থ এগুলোর পেছনে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো, উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক কোনো ফলাফলের আশা নেই।

কারণ, পশ্চিমা খ্রিস্টীয় চার্চ প্রতিনিধিদের সাথে ওলামায়ে ইসলাম ও ইসলামি স্কলারদের যে সংলাপগুলো হয়েছে এবং হচ্ছে; যেকোনো সংলাপের প্রথম, প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শর্তটি সেটিই তাতে অনুপস্থিত। সব সময়ই এমনটি হয়ে আসছে। সে শর্তটি হল প্রতিনিধিরা

একজন অপরজনকে (প্রতিপক্ষ হিসেবে) মেনে নেবে এবং তার কথা (হক প্রমাণিত হলে) গ্রহণ করবে।

সংলাপ তো দু'পক্ষের মাঝে হয়ে থাকে। একপক্ষ পেশ করবে আরেকপক্ষ গ্রহণ করবে; যেন উভয়ের মাঝে বিনিময় হয়। কিন্তু সংলাপ যদি এভাবে হয় যেভাবে বর্তমানে চলছে যে, একপক্ষ তো অপরপক্ষকে মেনে নেবে কিন্তু অপরপক্ষ তার প্রতিপক্ষকে মেনে নেবে না তাহলে এখানে আসলে সংলাপ হচ্ছে শুধু নিজের সাথে, অপরপক্ষের সাথে না। এখানে শুধু পেশই হচ্ছে, গ্রহণ হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে এটি বধিরদের সংলাপে পরিণত হবে।
ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে প্রতিপক্ষের অবস্থান অস্বীকৃতিমূলক। তারা ইসলামকে একটা পক্ষ বলে স্বীকারও করবে না, এ পক্ষের কোনো কিছু গ্রহণও করবে না। তাদের দুনিয়ায় ইসলাম কোনো আসমানি ধর্ম নয়। এ ধর্মের রাসূল তাঁর রাসূল হওয়ার দাবিতে সত্যবাদীও নয় এবং এ ধর্মের ধর্মীয় কিতাব আসমান থেকে অবতীর্ণ কোনো ইলাহি কিতাবও নয়।

যেখানে একপক্ষ (অর্থাৎ মুসলিমরা) তার প্রতিপক্ষকে প্রতিপক্ষরূপে মেনে নেয় এবং প্রতিপক্ষের ধর্মকে (বিকৃত হলেও) আসমানি ধর্ম স্বীকৃতি দিয়ে তাকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করে অথচ অপরপক্ষ আমাদেরকে কেবল একটা নিছক মতবাদের কাতারে রাখে, আসমানি ধর্মের আওতায় ধরে না- সেখানে সংলাপই কিভাবে হবে আর সংলাপ ফলপ্রসূইবা কিভাবে হবে?!

এটিই হল সেই প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয় শর্তটি যেটি অনুপস্থিত। সংলাপের পেছনে শত শ্রম দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশাল অংকের ব্যয় হয়েছে এবং হচ্ছে। সম্ভাব্য সকল পথ-পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেকটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, যেগুলো ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে, সবগুলো নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার এটিই রহস্য (যে, প্রথম শর্তটিই তাতে অনুপস্থিত)।
আহুত সংলাপগুলো থেকে আমার দূরে সরে আসার দ্বিতীয় কারণটি হলো, সংলাপের অন্তরালে মুসলমানদের নিয়ে প্রতিপক্ষের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি অবগত হতে পেরেছি। তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। আর এটা জন্য আবশ্যক না বললেও তাদের অধিকার বলতে পারি। তবে ইসলাম সম্পর্কে তারা এ জন্য জানতে চায় না যে, বিভিন্ন ধর্ম ও শরীয়তের মধ্যে ইসলামকেও একটি ধর্ম হিসেবে মেনে নেবে; বরং এজন্য জানতে চায় যেন ইসলামকে

মিটিয়ে দিতে পারে এবং মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর মাধ্যমে ইসলামের নাম-নিশানা বিলীন করে দিতে পারে।

তারা মুসলিমদের সাথে সংলাপ এজন্য করতে চায় না যে, জীবনের নানাবিধ সমস্যাগুলো সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে ঈমানিপন্থায় সমাধান করবে, বরং সংলাপ করতে চায় এজন্য যাতে ঐসব জুলুমকে বৈধ সাব্যস্ত করতে পারে – বা অন্তত সেগুলোর আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিতে পারে- যেগুলোর আগুনে মুসলিমরা দগ্ধ হচ্ছে। যেগুলো উপনিবেশবাদী মহলগুলো চালিয়েছে এবং চালাচ্ছে। বরং মুসলিম বিশ্বে এসব জুলুম চাপাতে এবং সেগুলো বৈধ করতে উপনিবেশবাদী মহলগুলো অনেক ক্ষেত্রে এই সংলাপধারী প্রতিপক্ষটিকেই ব্যবহার করেছে।

মুসলমানরা যে তাদের জীবন ধারণের মৌলিক ও মানবিক অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত; জেরুজালেম, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, কোসোভো, সান্দজাক, কাশ্মির, ফিলিপাইনসহ অসংখ্য ভূমিতে যে তারা নেতৃত্বহারা এবং আগ্রাসনের শিকার- ধর্মীয় সংলাপ সম্মেলনগুলোতে এর কোনোটিই আলোচনায় আসে না।

বরং মুসলিমদের খ্রিস্টান বানানোর প্রচেষ্টামূলক এসব সম্মেলন –যেগুলোতে পশ্চিমা প্রতিটি চার্চ প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নেয়- সেগুলোর দলিল-দস্তাবেজ এ কথার সাক্ষী যে, তাদের কাছে ধর্মীয় সংলাপ মানে কিছুতেই এমনটি নয় যে, ধর্মান্তরিত করার জন্য তারা যে বিপুল আগ্রাসী শক্তি ও কৌশলগত প্রচেষ্টা ব্যয় করে থাকে সেগুলো থেকে তারা ফিরে আসবে। বরং অনেক সময় এসব সংলাপ খ্রিস্টান বানানোর স্তরগুলোর একটা স্তর হয়ে থাকে।

আশির দশকে ওমানে আরেকটি সংলাপে আমি যোগ দিয়েছিলাম। 'সরকারি ইসলামী সভ্যতা গবেষণা সংস্থা' তার আয়োজন করে। ক্যাথলিক চার্চের সাথে এ সংলাপ হয়েছিল। জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আমাদের ন্যায়সংগত পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে কোনো একটা বাক্য তাদের থেকে বের করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনর্থক। আমাদের সকল প্রচেষ্টা হাওয়ায় উড়ে গেল। বরং উল্টো তারা আমাদের মুসলিম বিশ্বকে ধর্মনিরপেক্ষ বানিয়ে ফেলার দাওয়াত দিলো। যাতে জাগতিক জীবনে ইসলাম কোনো জীবন-বিধানরূপে বহাল না থাকে। আর এটি মূলত মুসলিমদের খ্রিস্টান বানানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ, যার ফলে আখেরাত জীবনে (মুক্তি ও কামিয়াবির) মাধ্যমরূপেও ইসলামের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না (বরং খ্রিস্টধর্মই মুক্তির পয়গামরূপে পরিগণিত হবে)।

সেদিন থেকে ধর্মীয় সংলাপের এ নাট্যমঞ্চগুলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার পাকাপোক্তা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই।"

- ড. উমারাসহ আরো বহু ইসলামিক স্কলারের অভিজ্ঞতা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রতিবেদনগুলো স্পষ্ট করে দিচ্ছে:
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইসলামের দাওয়াত নয়, ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র।
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আন্তর্জাতিক কুফফারগোষ্ঠী এবং তাদের স্থানীয় এজেন্ট মুসলিম নামধারী তাগুতদের হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং সেগুলোর কলকব্জা তারাই নাড়িয়ে থাকে।
- সম্প্রীতির নাম করে ইসলামকে তরলায়িতকরণ এবং ইসলামী আকিদা বিনষ্ট করার প্রয়াস আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।
- মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার প্রাথমিক প্রকল্প আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মুসলিম বিশ্বে ধর্মদ্রোহিতা ও সেকুলারিজম বিস্তারের দাওয়াত।
- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ দমনের ভিন্নরূপী কৌশল আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।
- মুসলিমদের উপর উপনিবেশবাদী আগ্রাসী শক্তিকে চাপিয়ে দেয়া এবং সর্বপ্রকারের জুলুম অনাচারের বৈধতা দানের প্রয়াস আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।[৪৫]

বিভিন্ন আলেমগণ আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সম্পর্কে
সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও তাগিদ দিয়ে যান।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খেলাফত ব্যবস্থা পতনের পর মুসলিম বিশ্বে যখন আগ্রাসী কুফরি শক্তি এবং তাদের স্থানীয় এজেন্ট মুসলিম নামধারী তাগুতরা চেপে বসে তখন থেকে উলামা শ্রেণীর মাঝে এমন বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে যে, সামান্য দুনিয়ার লোভে দ্বীন বিক্রি করে দেয়ার মতো আলেম প্রচুর পরিমানে দেখা যাচ্ছে। যেকোনো কুফরি মতবাদের স্বপক্ষে কাফের ও তাগুতগোষ্ঠী একদল আলেম যোগাড় করতে সমর্থ্য হচ্ছে। শরীয়তের নুসূসের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করে এরা আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় যেকোনো কর্মকাণ্ডকে বৈধ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করছে। আন্তঃধর্মীয় কুফরি সংলাপের বিষয়টিও এর ব্যতিক্রম নয়। ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, মানজুরে ইলাহী ও মুফতি ফয়জুল্লাহ জাতীয় লোকেরা এ কাজটিই করেছেন ও করছেন। তবে এ ব্যাপারে তাদের লেখালেখি নেই বললেই চলে।কুরআন সুন্নাহ বিকৃত করে কুফরি সংলাপের পক্ষে দলীল প্রমাণ যোগাড়ে এগিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা প্রফেসরগণ।

মুসলিমদের সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র আন্তঃধর্মীয় সংলাপই যে পথ, তা অমূলক।কাফের মুরতাদ ও তাগুতদের আবিষ্কৃত এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত আন্তঃধর্মীয়

সংলাপ।এর সে ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য যেটা তারা দিয়েছে। যেমন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি কুফরি পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা তাদের থেকেই নিতে হবে যারা এগুলোর আবিষ্কারক ও ধারক-বাহক। নিজে থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বৈধ সাব্যস্ত করার সুযোগ নেই।এই সকল শর্তে কখনই সংলাপের যাওয়ার কোনো বৈধতা ইসলামি দৃষ্টিতে নেই। যেখানে কাফের বা মুরতাদরা ইসলামের নাম গন্ধ পছন্দ করেনা, সুযোগ ক্ষেত্রেই তাদের জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করে। নিশ্চয়ই তাদেরকে কখনোই নিজেদের আলোচনা সংগঠনে ধর্ম প্রচারে সুযোগ করে দেবে না।

কোরআন-সুন্নাহকে বিকৃত করে সংলাপের বৈধতা দেয়ারও চেষ্টা চলছে।এবিষয়ে তারা বিভিন্ন আয়াত কে সামনে এনে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ্রিস্টানদের দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন, নাজরানের খ্রিস্টানরা মদীনায় আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের কথা বার্তা হয়। রাসূলকে সত্য নবী বুঝতে পেরেও তারা ঈমান আনেনি। হটকারিতায় অটল থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চ্যালেঞ্জ দিয়ে মুবাহালার ডাক দেন। এতে তারা পিছু হটে যে, নবীর সাথে মুবাহালা করতে গেলে আমাদের বংশশুদ্ধ নিপাত যাবে। তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়,

“আপনার কাছে (ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে বলুন, চলো, আমরা ডেকে আনি আমাদের সন্তানদের আর তোমরা তোমাদের সন্তানদের, আমরা আমাদের নারীদের তোমরা তোমাদের নারীদের, আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের আর তোমরা তোমাদের নিজেদের লোকদের, তারপর আমরা সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করি যে, (আমাদের দু’পক্ষের মধ্যে) যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হোক।”
–সূরা আলে ইমরান (৩) : ৬১

এতে তারা ভড়কে যায়। বিতর্ক পরিত্যাগ করে সন্ধির রাস্তা ধরে। জিযিয়া দিতে সম্মত হয়। সহীহ বুখারিসহ অন্যান্য হাদিস ও সীরাত গ্রন্থে বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ আছে।

আন্ত ধর্মীয় সংলাপ একমাত্র গ্রহণযোগ্য তখনই কিছু ইসলামিক শর্তসাপেক্ষে যখন এর প্রয়োগ করা হয়। তথাকথিত ইসলামিক শর্তসাপেক্ষে বললেও এটি সাধারণত প্রত্যেক ধর্মেরই মৌলিক শর্ত। যেকোনো ধর্ম তা নিজেকে স্পষ্ট করে রাখার অধিকার রাখে। যদিও আমরা জানি একমাত্র ইসলামই সত্য ধর্ম। এবং প্রমাণাদি সহকারে ইসলামই এগিয়ে। তাই নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ ও প্রচার করার স্বাধীনতা থাকতে হবে।

অনেকেই নববী দাওয়াতের বিকল্প হিসেবে সংলাপের পথ গ্রহণ করে। যেদিকে সংলাপ ও নববীদাওতের মধ্যকার কোন সম্পর্কই নেই। দুটো একেবারেই ভিন্ন ।

নববি দাওয়াতের প্রকৃত চিত্র: এ কথার সাক্ষ্য ও ঘোষণা যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মনোনীত তাওহিদের ধর্ম ইসলাম একমাত্র হক দ্বীন। অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদ বাতিল। আমরা তোমাদের মানি না, তোমাদের ধর্মও মানি না। তোমাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন। তোমরা আমাদের দুশমন, আমরা তোমাদের দুশমন। দ্বীনে হকের দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হও, নয়তো চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনের জন্য প্রস্তুত হও। আর দুনিয়াতে তোমাদের সাথে ফায়সালা হবে তরবারি দিয়ে। মুসলমান হও, নয় জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হও, নয় তরবারি হাতে ময়দানে আস।

অন্যদিকে সংলাপ ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্বাসী। গরম যে ধর্মাবলম্বীগণ নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য করে ঘোষণা করে তাদেরকে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে।

তাই এই দুইটিকে একত্রিত করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অবস্থার প্রেক্ষিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আমাদের জন্য কয়েকটি পথের একটি পথ ইসলামকে সঠিকভাবে প্রকাশ ও প্রচার করার। তবে অবশ্যই এটি শর্তসাপেক্ষ এবং ক্ষেত্রবিশেষে হতে হবে।

আন্ত ধর্মীয় সংলাপ শুধুমাত্র সামাজিক সংরক্ষণশীলতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঠিক যেমনটা একই সমাজে ভিন্নমাতার মানুষ বসবাস করে। তবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ শুধুমাত্র সহাবস্থান ও সামাজিক সহিংসতা দূর করার ক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য।কোনো ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় প্রচারনায় নয়। কেননা , Religious presentation cannot be proceed under those circumstance.

শর্তসাপেক্ষে সংলাপ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অনেক নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে ফেতনা ও বেধর্মীদের নিয়মতান্ত্রিক সমাজে ইসলামকে উপস্থাপন করার অন্যতম মাধ্যম এই সংলাপ।একটি সমাজে অন্যসকল ধর্মাবলম্বীদের সাথে বসবাসের জন্য শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।যাতে ধর্মীয় শিষ্টাচার ছাড়া , ধর্ম কেন্দ্রীক নিয়মের কোনো বাধা-ধরা নিয়ম সংযুক্ত নয়।সেই সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সহাবস্থান পোক্ত করার পথ হিসেবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মুখাপেক্ষী হওয়া যেতে পারে।

এটি সমাজকে সুন্দর করতে গেলে তার ভেতরকার উপাদান, যেমন সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিকতা শিষ্টাচার প্রধান। কেননা সমাজে কি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা মানুষের দ্বারা তৈরি এবং মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই সে সমাজে বসবাসরত মানুষের উপরেই নির্ভর করছে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

এখানে ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের বসবাস । তাই একই সাথে বসবাস করতে গেলে সহনশীলতাও সহানুভূতিশীলতা উভয়ের দরকার। যেই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে উশৃংখলার সৃষ্টিকারী প্রত্যেকেই সমান অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে তাই হবে সমাজের মাপকাঠি।

চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি যে কোন অপরাধী সকল ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে সমান হিসেবে পরিগণিত হবে। এই বিষয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ নিতে হবে।

কেউ কারো ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ করতে পারবে না। কেননা যার যার ধর্মীয় উপাসনালয় তাদের কাছে পবিত্র ও উত্তম স্থান। তবে এক্ষেত্রে যদি ইসলামী শরীয়ত দৃষ্টিকোণে দেশ পরিচালিত হয় সে ক্ষেত্রে জিজিয়া প্রক্রিয়া ওপর নির্ভর করতে হতে পারে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ, তাই ইসলামে আঘাত হানে এমন কোন কাজই যাতে ঘটতে না পারে সেদিকে সমাজ প্রধান বা সরকার প্রধানকে ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনায় এবং উৎসবে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

অর্থাৎ সামাজিক সহাবস্থান নৈতিকভাবে পরিচালনা করতে এতে পৌরনীতির বিষয়বস্তু প্রাধান্য পাবে। নাগরিকের সুশিক্ষা রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখছে।

এই সকল ধরনের আন্তঃ ধরনের সংলাপে বিষয় বুঝতে হবে নাগরিক ও পৌরনীতি। ধর্মের অন্তর্গত কোন নিয়মে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সেই বিষয়ে আলাদা সংলাপ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় প্রসারণ ঘটাতে যে ধরনের আলোচনা হওয়া উচিত তাতে আন্তজাতীয় সংলাপের শর্তগুলো অনুপস্থিত থাকতে হবে। কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ তা একমাত্র

উপস্থাপনার মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব তাই কোন ধর্ম কোন ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ নয় এই মূলনীতি থাকা যাবে না। ধর্মীয় সংলাপের ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তু হবে সহনশীলতার সাথে আলাপ আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সততা ও সহশীলতার মাধ্যমে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ সামনে প্রকাশ করা।কেননা, ধর্মীয় সৌন্দর্য প্রকাশ না করলে ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্য ধর্ম প্রকাশিত না হলে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান মানুষ্যে মধ্য থেকে হারিয়ে যাবে।মানুষ হয়ে যাবে উগ্র কেননা ধর্মীয় নৈতিকতা ও শিষ্টাচার মানুষকে সংযত হতে সাহায্য করে।ইহকালের পাশাপাশি পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে ।তাই সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির ধারনা থাকা জরুরী। আর একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কে সমাধান হতে পারে। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে নিজেকে ধর্ম সম্পর্কে সবটা তুলে ধরাই সংলাপের প্রধান উদ্দেশ্য। কোন ধর্মীয় সংলাপের শর্ত হিসেবে যদি নিতান্তই বিধি নিষেধ রাখতে হয় তবে তার সৎ ও সত্য তথ্য উপস্থাপন করার শর্ত হওয়া উচিত।কেননা মিথ্যা ও হঠকারিতা কখনই ধর্মের সঠিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে পারে না।

সংলাপ বৈধ হওয়ার অন্যতম শর্ত গুলো হলো , **সাধারণ শর্তগুলো প্রত্যাহার করা।**

- সকল ধর্মকে সমান ভাবা।
- নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্ব না দেয়া।
- ধর্মীয় লিমিটেশন বা ভেদাভেদ তুলে দেয়া।

কেননা মানুষের এ জায়গাটি এবং পরলৌকিক জীবনের অন্যতম পরিচয় ধর্ম। ধর্ম সাধারণ জীবনে কখনোই ভেদাভেদ তুলে আনে না যেমন, সমাজে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ,ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, পেশা জীবনে ইত্যাদি। ধর্ম আর মানুষকে সংযত সহানুভূতিশীল ও সৎ হতে সাহায্য করে,অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করে। ধর্মীয় রক্ষণশীলতাই মানুষকে নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সহাবস্থান হচ্ছে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক সুন্দর রেখে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে একই সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে বসবাস করা। এতে ধর্মীয় অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণের কোন পরিবর্তন বাও করার উদ্দেশ্য মূলক কারণ প্রণয়ন করা যাবেনা। আর এই সকল সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজে সংগঠিত অন্যায় অপরাধের সমাধানের জন্য সংলাপের প্রয়োজন। যে সমাজের যুগে যুগে অনেক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে একটি প্রাচীন সমস্যা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। সকল ধরনের স্বকীয়তা বজায় রাখার পাশাপাশি চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ভুল বোঝাবুঝি, জ্ঞানের অভাবে এমনটা হয়ে থাকে। তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক ধর্মের জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যকার

আলাপ আলোচনায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। এ সকল আন্ত ধর্মীয় সংলাপ শুধুমাত্র সমাজের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর উচ্চমাত্রায় একমাত্র ধর্মীয় প্রশংসা ও প্রচারণার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা যেতে পারে তাও শর্ত সাপেক্ষে।
আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করতে পারি তবে এর বিষয়বস্তু নয়। কেননা এটি মূলত ভিন্নধর্মীদের অদ্ভুত একটি সিস্টেমেটিক প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে তারা সকল ধর্মকে একত্রিত বা সমান প্রচারণা জন্য উদ্ভব করেছে। যা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা প্রচারণা ও সমস্যার সমাধানের সাথে ব্যবহার করতে পারি।

ইসলামে সব স্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কেননা তাছাড়া ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশের রাস্তা প্রায় বন্ধ। বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার একটা কাজ করে যা ইসলামকে উগ্র ও সন্ত্রাসীর ধর্ম গোষ্ঠী হিসেবে প্রচারণার কাজ চালাচ্ছে। তাই যতক্ষণ না ইসলাম তথা মুসলিম নিজস্ব স্বকীয়তা সৌন্দর্য সবার সামনে তুলে ধরতে পারছে , ততক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করানো সম্ভব নয়।
তবে এদিক থেকেও কিছুটা জটিলতা রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব মানব ধর্ম নামক একটি প্রোপাগান্ডার ভেতর চলছে। এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ সহজ ও নিচু জীবন যাপনের ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে মানুষ খুব সহজেই তাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণ করতে পারে কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদেরকে এটা বৈধতা প্রদান করা হয়। যেখানে ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে যারা মানব ধর্মে বিশ্বাসী তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটু উগ্র। মূলত নিজেকে সমর্পণ করায় বিশ্বাসী। যেমন, কোনো ধর্মে বেড়াজাল ছাড়া উশৃংখল জীবনযাপন, যেখানে শুধু একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীলতায় প্রধান। জীবনযাপনের সৌন্দর্য বিধি নিষেধ একেবারেই অনুপস্থিত। ফলে পশ্চিমা বিশ্বে কিছু কিছু মানুষের কাছে ইসলাম ঠিক ততটুকুই সৌন্দর্য বহন করে যতক্ষণ ইসলাম নীরব ভূমিকা পালন করে। তারা ইসলামের নিরবতা শান্তিপ্রিয় দৃষ্টিকোণ গুলোই শুধুমাত্র পছন্দ করে। তবে অন্যায়ের প্রতিবাদ, আত্ম সমালোচনা, স্বকীয়তা , শ্রেষ্ঠত্ব, অবস্থানের পার্থক্য এ সকল দিক থেকে তারা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করে না। যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য। রাসূলের পবিত্র ভূমি সৌদি আরব , সংযুক্ত আরব আমিরাত বর্তমানে পশ্চিমা সভ্যতার সংস্কৃতি আত্মস্থ করায় ব্যস্ত। ইসলামে ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এর ইঙ্গিত করে। ঠিক তেমনি তুরস্ক, মিশর ইত্যাদি। এই সকল শক্তিশালী দেশসমূহ বন্ধুত্ব ও শান্তিপ্রিয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বেশি পারদর্শী। তবে তাদের ইসলামিক অবকাঠামো দিক থেকে নিজস্ব স্বকীয়তা ধীরে ধীরে বলি হচ্ছে এসব স্থানে ক্ষেত্রে। ইহুদী নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক তৈরি করতে গিয়ে ইসলামী ইতিহাসের সোনালী খেলাফতের বৈশিষ্ট্য গুলো হারিয়ে ফেলছে। আর ঠিক তাই এখন প্রায় বেশিরভাগ পশ্চিমা

আধুনিক বিশ্বের মানুষের কাছে এই সকল দেশ গুলো বেশি প্রিয়। তারা খুবই সন্তুষ্টি মনে নিজেদের প্রিয় দেশের বা বসবাসের হিসেবে এ সকল দেশগুলোর কথা উল্লেখ করে থাকে। সংস্কৃতি তাদের সৌন্দর্য একইভাবে পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। ঠিক তার বিপরীত হচ্ছে তাদের দেশে। আজও পৃথিবীর অধিকাংশ বেধর্মীদের দেশে ইসলাম কুন্ঠিগত।যেখানে মুসলিম দেশগুলো নিজেদের সংস্কৃতিতে বেধর্মী সংস্কৃতি গুলো জায়গা দিচ্ছে ঠিক তেমনি বে ধর্মীদের দেশে ইসলামের বিধি নিষেধ আজও ঢিলে ঢালা।হিজাব বিতর্কে হিজাব তুলে দিলেও আজও হিজাব নিষিদ্ধ দেশগুলোতে হিজাব আইন শিথিল হয়নি।এই পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারন সহাবস্থানের জটিলতায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ছত্রছায়ায় বা ফাঁদে পা ফেলা। তাই এই **আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে ইসলামে শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করতে হবে**।নতুবা এর ভিন্ন উদ্দেশ্যই ধীরে ধীরে সাফল্য লাভ করবে।

বর্তমানে সহাবস্থান ও সংলাপের প্রভাব

মানব শরীরে রোগব্যাধি প্রায় বাসা বাধে, তা নিরাময়ের জন্য আমরা গ্রহণ করি ওষুধ। তবে নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন ওষুধ অনিয়ম করে বা অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় যাকে আমরা বলে থাকি সাইড ইফেক্ট। সকল কিছুর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। বর্তমান সমাজে সহাবস্থান ও সংলাপের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিকই রয়েছে। যদিও ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাব প্রমাণে বেশি পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমানে ধর্মীয় ভিন্নতাকে কিছু মানুষ,মানবিকতার দিক থেকে অনৈতিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে.... উক্তির বহুল ব্যবহার।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার পারস্পরিক মূল ধারণা,সংঘাত সংশোধন করা যায়। একটি ধর্মের মধ্যকার নিয়ম, বিভিন্ন রকমের, তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখে। ভিন্ন নিয়ম চিন্তা ভাবনা হওয়ার কারণে তাদের মধ্যকার মতো বিরোধ চিন্তাভাবনা পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। আর একই সমাজের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে একেকজনের চিন্তাভাবনা এবং নিয়মের প্রতি সম্মান রেখে বসবাস করতে হয়। আর তার জন্য দরকার মধ্যকার সকল সমস্যার নিরাময়। আর তা একমাত্র আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সম্ভব। বর্তমানে যুগের প্রাচীন ধর্মগুলোর সাথে অনেক নতুন নিয়মের ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে,বেড়েছে পার্থক্য। তবুও সামাজিকতার খাতিরে একে অপরের প্রতি সম্মান রেখে বসবাস করতে হয়। যেহেতু মতপার্থক্য অনেক বেশি, তাই সমালোচনার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যকার পার্থক্যগুলোকে চিহ্নিত করা যায় এবং সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শুধু সামাজিক পরিবেশ ঠিক রাখার ক্ষেত্রেই নয় বরং ব্যক্তি ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্ব বহন করে।

একমাত্র মনোনীত ও সত্য ধর্ম। তবে সমাজে আরো ধর্মের উপস্থিতি রয়েছে। তাদের কাছে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য সংলাপ অন্যতম মাধ্যম।তবে অবশ্যই সাধারণ শর্তগুলোকে স্থবির রেখে সংলাপে বসতে হবে।যেমন,নিজের ধর্মীয় নিয়মনীতির সংকীর্ণতা মেনে নিয়ে আলোচনায় যাওয়া,এসকল শর্ত থেকে বেড়িয়ে প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে নিজের ধর্মের সৌন্দর্য তুলে ধরতে হবে।কোনো বিষয়ে বিতার্কিক হতে হলে উৎকৃষ্ট উপায়ে বিতার্কিক আলোচনায় যেতে হবে।

তবে বর্তমানে সংলাপের মাধ্যমে ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিকতার যুগে মানুষ ধর্ম-কে একটি ঐচ্ছিক বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করছে। Personal choice হিসেবে দিন দিন পরিচিতি পাচ্ছে।সেখানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে এর ব্যক্তি

ক্ষেত্রে গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে।এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধর্ম আলাদাভাবে অবস্থান নেয়।এছাড়া নতুন মানবতৈরী ধর্মগুলো সমাজ থেকে উৎপাটনে প্রত্যেক প্রাচীন ধর্মগুলো একত্রিত হয়ে কাজ করতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে ধর্মানুভূতি কে 'ধর্মান্ধ' নামকরণ করা হয়েছে যাতে খুব সহজেই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমাজ থেকে তুলে ফেলা যায় । একটা সমাজকে ধ্বংসের প্রধান ও সহজ উপায় সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের মানুষ থেকে নিশ্চিহ্ন করা।ফলে মানুষ অনিয়মে অভ্যস্ত হয়ে ,সভ্যতার বিপরীতে চলতে থাকে।কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ সমাজে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে সকল মানুষের মাঝে একটি অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে। এরা নিজেরা কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশ্বাসী নয় তবে যারা ধর্মীয় নিয়ম-শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত তাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করার করে থাকে। সমাজের উশৃঙ্খলা সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ উপায় বিবেক,ধর্মীয় মূল্যবোধ লোপ পাওয়া।আর এ জন্যই কিছু গোষ্ঠী চেষ্টা করে যাচ্ছে সমাজ থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ তুলে ফেলতে।নাস্তিক ব্যক্তিদের জীবন-যাপন অনেকটাই আলাদা।বাধা-ধরা নিয়ম বিহীন জীবন,কোনো সৎ গুনেরই গুরুত্ব বা কদর নেই তাদের কাছে।শুধু প্রয়োজন আত্মতুষ্টি।যার দ্বারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়,তাই করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায়।এর নেতিবাচক বা ইতিবাচক দিক,সমাজে এর প্রভাব,এর প্রয়োগে ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে এদের কোনো মাথা ব্যাথা থাকে না।ফলে এদের কর্মকান্ডে সমাজে সৃষ্টি হয় উশৃঙ্খলা।বিবেক জ্ঞানহীন অবস্থায় এরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। সহানুভূতিশীলতা, সহনশীলতা তো দূরে থাক বরং সদব্যবহার এদের মধ্যে দেখা যায় না। সহাবস্থানের ক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে মানবীয় গুণাবলী।

সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানের বড় হাতিয়ার সেসকল ধর্ম বিদ্বেষী লোকদের জন্য। একই সমাজে একাধিক ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে। যাদের জীবন ব্যবস্থা ও বিশ্বাস প্রায় ভিন্ন। পরে এদের মধ্যকার বিবেকের কাজে লাগিয়ে সমাজে সাম্প্রদায়িক উশৃঙ্খলা সহজেই তৈরি করা যায়।তাই তাদের প্রথম পদক্ষেপ ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।প্রত্যেক ধর্মের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে,যা প্রত্যেক ধর্মীয় ব্যক্তিকে মানতে হয়।অনেক সময় এসকল নিয়ম, বিধিমালা পরস্পরের জন্য সাংঘর্ষিক হয়।তখনই ধর্মীয় দায়িত্ব শীতলতা থেকে নিজেদের অবস্থান থেকে দাঁড়ায়।ফলে শুরু হয় মতবিরোধ। সহাবস্থান সফল করতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যেক ধর্মের ব্যক্তিকে নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মের নিয়মের প্রতি ধৈর্যশীল হতে হবে ।ঐ সকল প্রশ্নবিদ্ধ নিয়মকানুন পরস্পরকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে আসতে হবে।কেননা কোনো ধর্মই অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো নিয়ম তৈরি করে না ।

যেমন,সকল গৃহপালিত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল,ঈদ-উল-আযহায় কোরবানি করার নিয়ম রয়েছে।হিন্দু সম্প্রদায়ে অনেকে শাকাহারী,এবং প্রধান গৃহপালিত প্রাণী গরুকে তা পূজো করে এবং সম্মান করে।ফলে , কোরবানি ঈদ তাদের জন্য একটি ধৈর্য্যের সময়।

আবার ,তাদের পূজোর সময় অর্ধনগ্ন মূর্তি প্রায় সব পূজো মন্ডপেই সাজানো থাকে,যা মুসলমানদের জন্য ধৈর্য্যের সময়।এসময়ে একে অপরের নিয়মের প্রতি ধৈর্যশীল ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রধান প্রমাণ কোনো ধর্মের নিয়ম পালনে বাধা প্রদান না করে সংযত থাকা এবং তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।তবে অনেকেই আক্রোশ বশত অন্যের জীবন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটায় যা সমীচিন নয়।আবার এক গোষ্ঠী মানব ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে,নিজস্ব ধর্মানুভূতিতে আঘাত হেনে অধিক ধর্মের অনুসরন করে যা উভয় রীতির জন্যই অসম্মান জনক,যেমনটা মধ্যপন্থা অবলম্বন কারীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ধর্মীয় স্বকীয়তা ধ্বংস করে একইসাথে বহু ধর্মের পছন্দমত নিয়ম পালনে বর্তমানের মানুষদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অভ্যাসগত কারণে মানুষের নেতিবাচক আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে কোন ধর্ম সঠিকভাবে অনুসরণ করে না, যাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা আটকে যেতে পারে।

তাই ধর্মীয় স্বকীয়তা বজায় রাখতেও সহাবস্থান ও অবস্থানের সমস্যা সমাধানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্ব বহন করে।

শুধু আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবহারও প্রয়োগ কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন কেননা বর্তমানে এর উদ্দেশ্য ও কর্ম প্রত্যেক ধর্মের স্বকীয়তা বিরোধী বিশেষ করে ইসলামের। ইসলাম মূলত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ শুধুমাত্র সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্যই প্রয়োগ মনে করে। নতুবা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বর্তমান শর্ত ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে কখনোই ইসলাম এটা অংশগ্রহণ করতে পারে না। কেননা এই সকল শর্ত ইসলামের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক । আন্ত ধর্মীয় সংলাপ শুধুমাত্র বর্তমানে সহ অবস্থান বজায় রাখার জন্য এবং সমাজের মূল্যবোধ অনুধি টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী। কেননা আধুনিকায়ন ও পশ্চিমা সংস্কৃতির বেশিরভাগই এখন ত্রিতত্ত্বে বিশ্বাসী। একই সাথে পুরো গোটা পৃথিবীর বর্তমান জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের এদিকে আকর্ষণের বহু রকমের ফেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া এই ফিতনা সমাজের চরম শক্তিশালী শিকড় গেড়ে বেড়ে চলেছে। আধুনিকায়নে সকল টেকনোলজির মধ্যে এখন এর প্রভাব। টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী,পোশাক-পরিচ্ছদে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে ইহজাগতিক আকাঙ্ক্ষা। যার বাইরে কোন ধর্মের ছেলে-মেয়েরাই নেই। তাই এই থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য সকল ধর্মের জ্ঞানী ব্যক্তিদের, ধর্ম বিশারদদের এগিয়ে আসতে হবে।

সামাজিক সাম্যতা বজায় রাখার পরবর্তী ধাপ সত্য ধর্মের প্রতি আকর্ষণ। ধর্ম ভীরুতা তৈরি হওয়ার পর সঠিক ধর্ম বাছাই প্রয়োজন কেননা বর্তমানে পৃথিবীতে অনেক ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা এক, তাই তাঁর কাছে পৌঁছানো ও তার দেয়া জীবন ব্যবস্থাও একই হওয়ার কথা। প্রত্যেকে সৃষ্টি করেছেন একইভাবে এবং দিয়েছেন রুহ। সৃষ্টি,সৃষ্টির জীবনদান, জীবনে ধরন যিনি দান করেছেন তার সান্নিধ্য পাওয়ার রাস্তা একই হবে। এবং তা যুক্তি কথা ভাবে চিন্তা না করলেও প্রত্যেকটি ধর্ম বিশারদ করলেই সত্য ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়। আর এটি সহজ ভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে তাদের কাজ সহজ করে দেয়া যায়। একজন ব্যক্তি যে কিনা সৃষ্টিকর্তার পথে ফিরে আসতে চায় সে সত্য ধর্মের সন্ধানে বের হলে বর্তমান ফেতনা যুগে হারিয়ে যাওয়ার ও সময় অপচয়ের একটি ঝুঁকি থেকে যায়। তাই তাদের জন্য আন্তঃ ধরনের সংলাপের ন্যায় ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ তার মাধ্যমে তারা প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্গত উভয়েরগত দিক সম্পর্কে জেনে সত্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে।

এইবার মানুষ যখন ধর্মভীরুতা অর্জন করে এবং একটি ধর্ম বা সত্য ধর্মই গ্রহণ করে তার পরেও সমাজে অনেক ধর্মের অবস্থান তাই প্রত্যেকের প্রয়োজন হয় সহাবস্থান।

যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে সহাবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াত মাধ্যম। যার মাধ্যমে দাঈ’রা খুব সহজেই দৈনন্দিন জীবন তুলে ধরে এবং ইসলামের মূল বার্তা অন্যান্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।

সহাবস্থানের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি ব্যবস্থাপনার ন্যায় ।যা সমাজে বসবাসরত ভিন্ন মতের প্রত্যেক গোষ্ঠীকে একসাথে থাকার সুযোগ সুবিধা করে দেয়। ভিন্নমত ও মতাদর্শকে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ পরস্পরের সামনে উন্মুক্ত করার উত্তম মাধ্যম।

ফুটনোট

- ১.উইকিপিডিয়া।
- ২.উইকিপিডিয়া।
- ৩. জাতীয় সংলাপ সেমিনার ১৯৯২-এর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট।
- ৪. প্রফেসর ড. মুহা. আব্দুর রহমান আদওয়ারী।
- ৫. উইকিপিডিয়া।
- ৬. আর রাহীকুল মাখতুম।
- ৭. সহীহ বুখারী,৭৯১৪।
- ৮.সুনানে তিরমিযী,২৪৭৩।
- ৯.সহীহ বুখারী,২৩৮৬।
- ১০. সুনানে আবু দাউদ, ৫১৫২।
- ১১.সহীহ বুখারী ,২৪৭৪।
- ১২.মুসান্নাফ আবির রাযযাক,৯৪৩০।
- ১৩.সহীহ বুখারী,২২৯১।
- ১৪.আবু দাউদ,কিতাবুল জিহাদ।
- ১৫.কিতাবুল খারাজ।
- ১৬. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ।
- ১৭.সূরা নাহলে,আয়াত ১২৫।
- ১৮.সূরা হুজুরাত,আয়াত ১৩।
- ১৯.সহীহ মুসলিম,১৫৩।
- ২০.প্রকাশিতব্য “ঈমান-আকীদা”
- ২১. সূরা বাকারা, আয়াত ২১৬।
- ২২. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০।
- ২৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯।
- ২৪. সারা বাংলা, অনলাইন নিউজ প্ল্যাটফর্ম।
- ২৫. মাওলানা আব্দুর রাশেদ।
- ২৬. সূরা মায়েদা, আয়াত ৩।
- ২৭. সূরা আলে ইমরান ,আয়াত ৮৫।
- ২৮. সহীহ মুসলিম, ৪০৩।
- ২৯. সূরা বাকারা, আয়াত ৭৯।

- ৩০. সূরা আল ইমরান, আয়াত ৭৮।
- ৩১. আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম; ৫/৬২
- ৩২. মাজমুইল ফাতওয়া;২৮/৫২৪।
- ৩৩.আশ-শিফা ২/২৮৬।
- ৩৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৮-১২০।
- ৩৫. সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ১-২।
- ৩৬. তাফসির আহসানুল বায়ান।
- ৩৭. সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭।
- ৩৮. সূরা বাকারা, আয়াত ১২০।
- ৩৯. সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪।
- ৪০. সূরা বায়্যিনাহ , আয়াত ৬।
- ৪১. সুরা বায়্যিনাহ, আয়াত ৭।
- ৪২. সূরা আলে ইমরান,আয়াত ২৮।
- ৪৩. সহীহ বুখারী, ২৩১৪
  সহীহ মুসলিম,৬৭৫০।
- ৪৪. মুসনাদে আহমাদ, ১৫১৫৬।
- ৪৫. Fatwaa Org , উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ।